বাৎসরিক পর্যালোচনা-২০২০

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল রিসার্চ (বিআইএসআর) ট্রাস্ট

হাসিনা ডি-প্যালেস, এ্যাপার্টমেন্ট # ৬/বি, বাসা # ৬/১৪, ব্লক-এ,
লালমাটিয়া, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

জানুয়ারি, ২০২০

সমাজ, সংস্কৃতি এবং খেলাধুলা

বিগত ২০২০ সালে কোভিড-১৯ বা করোনা মহামারির ফলে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটের ন্যায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের মাঝেও বছরজুড়ে আতঙ্ক-উৎকণ্ঠা বিরাজ করেছে। প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরেও সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছে তবে এবারের পরিবর্তনগুলি ছিলো অন্যরকম। কিছু কিছু ঘটনা বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝে ব্যাপক আলোচনার সৃষ্টি করেছে। বছরটিতে ঘটে যাওয়া উল্লেখযোগ্য ঘটনাগুলি নিম্নে উল্লেখ করা হল।

বছরটিতে সবকিছু এলোমেলো করে দিয়েছে করোনার আঘাত। করোনার কারণে বছরের অর্ধেকের বেশি সময় ধরে সরকার ঘোষিত 'সাধারণ ছুটি' এবং 'স্ব-আরোপিত নিষেধাজ্ঞা'-এর ফলে মানুষ এক ধরনের 'গৃহবন্দীত্ব' বা লকডাউনে আবদ্ধ ছিলো যা মানুষের জীবনযাত্রাকে থমকে দিয়েছিলো। গত ৩০ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সারা বিশ্বে ৮ কোটি ২৩ লাখ ২৭ হাজার ৪৯৮ জন মানুষ করোনায় আক্রান্ত হয় এবং ১৭ লাখ ৯৬ হাজার ৫৪৫ জন মানুষ ভাইরাস আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বিভিন্ন সংস্থার পূর্বাভাস অনুযায়ী বাংলাদেশ করোনার অন্যতম ঝুঁকিতে থাকলেও অন্যান্য বা পার্শ্ববর্তী দেশগুলির তুলনায় বাংলাদেশে প্রাণহানির সংখ্যা কমই ছিলো। গত ডিসেম্বর ৩০, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত সারাদেশে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ছিলো ৫ লাখ ১১ হাজার ২৬১ জন এবং ৭ হাজার ৫০৯ জন রোগটিতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। এই শতাব্দীতে বাংলাদেশে এক বছরে এতসংখ্যক 'অস্বাভাবিক' মৃত্যু আর কোন বছর ঘটেনি।

গত ২০২০ সাল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী যা 'মুজিববর্ষ' হিসেবে ঘোষিত হয়েছিলো। মুজিববর্ষকে ঘিরে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক সংগঠন, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচী ঘোষণা করলেও তার অধিকাংশই উদযাপন করা সম্ভব হয়নি মহামারির কারণে।

করোনার স্বাভাবিক মৃত্যুর মধ্যে মানুষ আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে পড়লে প্রথম দিকে করোনা আক্রান্ত ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে 'একঘরে' করে দেয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এমনকি নিজ পরিবারের সদস্যকে করোনা আক্রান্ত সন্দেহ করে অন্যত্র ফেলে রাখার মত কয়েকটি অমানবিক ঘটনাও জানা গেছে। এছাড়া কিছু কিছু ক্ষেত্রে করোনায় আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির 'মৃতদেহ' এলাকায় ঢুকতে বাধা দেয়া ও দাফন বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বাধা দেয়ার ঘটনা জানা যায়। এই ধরনের সামাজিক পৃথকীকরণ বা বর্জন (সোশ্যাল আইসোলেশন) বাংলাদেশে আগে খুব একটা দেখা যায়নি। এ সব ক্ষেত্রে পুলিশসহ কিছু স্বেচ্ছাসেবককে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। প্রথমদিকে করোনা আতঙ্কের কারণে অনেকেই চাল, লবণ, মাস্ক, স্যানিটাইজার, কিছু নির্দিষ্ট ধরনের ঔষধ ইত্যাদি অতিরিক্ত পরিমাণে ক্রয় করে মজুদ করে রাখলে বাজারে তাঁর কৃত্রিম সংকট ও উচ্চমূল্য তৈরি হয় যা সাধারণ ও নিম্ন আয়ের মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যায়। এমন পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য বিআইএসআর ট্রাস্টের প্রধান গবেষক ড. খুরশিদ আলম পরামর্শ প্রদান করেছেন যা পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে যেমনঃ বাংলাদেশে করোনা বিস্তারের প্রথম দিকে দেশের যেসব অঞ্চলে কৃষকরা ধান ঘরে তুলেছিলো তাদের নিকট থেকে বিক্রয়যোগ্য ধান কিনে নিয়ে যাদের প্রয়োজন তাদেরকে দেওয়া; ব্যাংকগুলো থেকে সরকারের ঋণ নেওয়া; বিদেশি সংস্থা থেকে ঋণ বা সহায়তা নেওয়া; নতুন নোট ছাপানো যদিও এক্ষেত্রে মুল্যস্ফীতি অনেক হবে বলে তিনি সতর্ক করেন, ইত্যাদি। এছাড়া, কিভাবে সহজেই বিভিন্ন উৎস থেকে দ্রুত সময়ের ভিতরে সরকার দরিদ্র লোকদের তালিকা করে সহায়তার সুষ্ঠু বন্টন করতে পারে সে বিষয়েও দিক নির্দেশনামূলক পরামর্শ দিয়েছেন।

করোনার কারণে এবছর প্রচুর মানুষ তাদের কর্ম হারিয়েছে। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান কয়েকমাস তাদের কর্মীদের বেতন দিতে পারেনি আবার অনেক প্রতিষ্ঠান বেতন কর্তন করেছে বা আংশিক বেতন প্রদান করেছে। ফলশ্রুতিতে, কেউ কেউ ঢাকায় থাকার খরচ জোগাতে না পেরে স্থায়ীভাবে ঢাকা ছেড়ে গ্রামে চলে যায়। কিছু কিছু পরিবার ঢাকার আশে পাশে তুলনামুলক কম ভাড়ার ফ্ল্যাটে স্থানান্তরিত হয়েছে। করোনার কারণে ঈদ এবং অন্যান্য সামাজিক উৎসবের আয়োজনকে সংক্ষিপ্ত করা হয়। এছাড়া ধর্মীয় উপাসনালয়গুলিতেও সমাগমের ক্ষেত্রে বিধি নিষেধ আরোপণ করা হয়। এ বিষয়গুলি নিয়ে মানুষের মাঝে মিশ্র প্রতিক্রিয়াও দেখা গেছে।

করোনার মধ্যে শহরের শিশুরা ও বয়স্করা সবথেকে বেশি 'বিচ্ছিন্নতায়' ভুগেছে। দীর্ঘসময় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সামাজিক আদান প্রদান বন্ধ থাকায় শিশুদের খেলাধুলা ও সামাজিক মিথষ্ক্রিয়া ব্যাহত হয়েছে। তরুণরা ভার্চুয়াল মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগ রক্ষা করতে পারলেও শিশু ও বৃদ্ধরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন থেকেছে। তবে, অনেক সংকটের মধ্যে থাকলেও করোনার সময় মানুষ পরিবারের সাথে সব থেকে বেশি সময় পার করার সুযোগ পেয়েছে। বাইরে ঘুরাঘুরি করতে না পারলেও পরিবারের সদস্যদের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় বা গল্প করা, টিভি বা ইন্টারনেটে অনুষ্ঠান দেখা, বাচ্চাদের সাথে খেলাধুলা করা, প্রভৃতি মাধ্যমে মানুষ সময় কাটিয়েছে।

বছরজুড়ে সামাজিক "দুরত্ব বা সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং" উচ্চারিত হলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে একে অপরের খোঁজখবর নেয়া, আত্নীয় স্বজনের পাশে দাঁড়ানো, সহায়তা করার যে দৃষ্টান্ত দেখা গেছে তা বরং প্রমাণ করে যে, মানুষ সামাজিকভাবে একে অপরকে অনেক বেশি উপলব্ধি করতে পেরেছে। সচ্ছল পরিবারগুলোর মধ্যে করোনার সময়ে দরিদ্র্য ও কর্মহীন মানুষদেরকে অর্থ, খাদ্য ও পণ্য দিয়ে সহায়তা করার প্রবণতা ছিলো লক্ষণীয়। তবে, মানুষের মধ্যে একে অপরের সাথে শারীরিক দুরত্ব বজায় রেখে চলার অভ্যাস দেখা গেছে। এমনকি দীর্ঘদিনের কিছু চর্চায়ও পরিবর্তন এসেছে যেমন কারো সাথে দেখা হলে হ্যান্ডশেক বা মুসাফা না করা, ঈদে কোলাকুলি না করা, কোন রোগি দেখতে গেলে তার গায়ে হাত না দেয়া, ইত্যাদি। বাসা-বাড়ীর কাজে অন্য সময়ের তুলনায় করোনা কালীন সময়ে নারীদের কাজের হার বেশি ছিলো। তবে শিশু ও পুরুষেরও অংশগ্রহণ ছিলো উল্লেখযোগ্য।

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে বরাদ্দের সাথে সাথে বেড়েছে উপকারভোগীর সংখ্যাও। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেটে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭৪ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা বা মোট বাজেটের ১৪.২১ শতাংশ তবে চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে এর পরিমাণ রাখা হয়েছে ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা যা জাতীয় বাজেটের মোট পরিমাণের ১৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ। মানব উন্নয়ন সূচকে ২ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। এই সূচকে ১৮৯ টি দেশের মধ্যে ২০১৯ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৫ তম যা ২ ধাপ এগিয়ে ২০২০ সালে ১৩৩-এ উন্নীত হয়েছে। রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের বিষয়টি গত বছরও যথারীতি বেশ আলোচিত ছিল। গত ২০২০ সালেও মিয়ানমারে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন শুরু না হলেও ভাসানচরে স্থানান্তর শুরু হয়েছে। গত ৪ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে ১ হাজার ৬৪২ জন রোহিঙ্গাকে কক্সবাজার থেকে ভাসানচরে স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে বহুল আলোচিত এই স্থানান্তর শুরু হয়।

গত বছরে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুও বেড়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)-এর ২০১৯ সালে প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু ৭২ বছর ৩ মাস ছিলো যা চলতি বছরে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২.৬ বছর। পাশাপাশি মানুষের জীবনমানেও পরিবর্তন এসেছে। দেশের ৯৮.১ শতাংশ মানুষ এখন নলকূপ থেকে পানি পাচ্ছে ও ৯৩.৫ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে।

করোনার কারণে আরোপিত 'লকডাউন' কিছুটা শিথিল হওয়ার সাথে সাথে বহুসংখ্যক বিবাহের ঘটনা ঘটতে থাকে তবে এক্ষেত্রে বিবাহের সংস্কৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে যেমন বড় পরিসরে অনুষ্ঠান না করে ঘরোয়াভাবে সম্পন্ন করা; কয়েক ধাপে-কয়েক দিনে বিয়ের অনুষ্ঠানকে ভাগ না করে শুধুমাত্র বর-কনের অভিভাবকদের উপস্থিতিতে বিবাহ সম্পন্ন হতে দেখা গেছে। করোনার মধ্যে গোপনে বাল্যবিবাহ সংগঠিত হওয়ার খবর বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বিবাহ বিচ্ছেদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছে। চলতি বছরের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত তালাক হয়েছে ৫ হাজার ৯৭০টি অর্থাৎ এই সময়ে প্রতি মাসে গড়ে ১ হাজার ১৯৪টি তালাকের ঘটনা ঘটেছে। ২০১৯ সালে প্রতি মাসে গড়ে তালাক হয়েছিল ৯২০টি। চলতি বছরের জুন-অক্টোবর এই পাঁচ মাসে তালাক বেড়েছে ২৯ দশমিক ৭৮ শতাংশ।

গত বছর দেশের শিক্ষাঙ্গণও থমকে ছিল করোনার প্রভাবে। করোনার কারণে ঘোষিত ছুটি কয়েক দফা বেড়ে আগামী বছরের ১৬ জানুয়ারী পর্যন্ত করা হয়েছে। তবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অনলাইনে ক্লাস ও পাঠদান কার্যক্রম চালিয়ে গেছে যা বাংলাদেশে জাতীয়ভাবে এবারই প্রথম ঘটেছে। অনলাইনে পাঠদানকে অনেকে সময়োপযোগী ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করলেও অভিভাবকদের অনেকেই এটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষার্থীদের জন্য 'মানসিক চাপ' হিসেবে সমালোচনা করেছেন।

এসএসসিসহ বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষা স্থগিত করা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা না নিয়ে জেএসসি এবং এসএসসি-এর উপর ভিত্তি করে ফলাফল নির্ধারনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ বিভিন্ন স্তরের মানুষের মাঝে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। অনেকে এই পদ্ধতির প্রশংসা করলেও কিছু কিছু মানুষ এর সমালোচনা করেন। কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বছরের শেষের দিকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে পরীক্ষা নেওয়া হয়। এছাড়া, বন্ধ থাকার ফলে এবছর পাবলিক পরীক্ষায় বরাবরের মত প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। বিগত ২০১৯ সালে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ঘটলেও ২০২০ সালে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় এরকম ঘটনা শোনা যায়নি। তবে সিলেটের এমসি কলেজের ছাত্রাবাসে সংগঠিত ধর্ষণের ঘটনা সারাদেশে ব্যপকভাবে আলোচিত হয়।

> *সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীতে বরাদ্দের সাথে সাথে বেড়েছে উপকারভোগীর সংখ্যাও। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের বাজেটে বাড়িয়ে করা হয়েছে ৭৪ হাজার ৩৬৭ কোটি টাকা বা মোট বাজেটের ১৪.২১ শতাংশ তবে চলতি ২০২০-২০২১ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে এর পরিমান রাখা হয়েছে ৯৫ হাজার ৫৭৪ কোটি টাকা যা জাতীয় বাজেটের মোট পরিমানের ১৬ দশমিক ৮৩ শতাংশ। মানব উন্নয়ন সূচকে ২ ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। এই সূচকে ১৮৯ টি দেশের মধ্যে ২০১৯ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ১৩৫ তম যা ২ ধাপ এগিয়ে ২০২০ সালে ১৩৩-এ উন্নীত হয়েছে।*

এমপিওভুক্তি এবং পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাসঁ কমেছে এবং এ ব্যাপারে সরকারের উদ্যোগ সাধারণ মানুষের প্রশংসা পেয়েছে। দেশে স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৭৪.৭ শতাংশ যা পূর্ববর্তী বছরে ছিল ৭৩.৯ শতাংশ; তবে শিক্ষার মান নিয়ে যথারীতি প্রশ্ন রয়ে গেছে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক প্রতিষ্ঠান কোয়াককোয়ারেলি সায়মন্ডসের (কিউএস) জরিপে 'বিশ্ব সেরা এক হাজার বিশ্ববিদ্যালয়ের' তালিকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) নাম এসেছে। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বুয়েট যথাক্রমে ৮০১ ও ১০০০তম স্থানে রয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় গবেষণা প্রতিষ্ঠানের র‍্যঙ্কিং-এ এগিয়ে আছে বাংলাদেশের

কয়েকটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। বাংলাদেশ উন্নয়ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান (বিআইডিএস) আন্তজাতিক উন্নয়ন নীতি বিষয়ক থিংক ট্যাঙ্ক ক্যাটাগরিতে ২৬ তম এবং দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মধ্যে ১৭ তম স্থান অধিকার করেছে।

বিগত বছরটিতেও বাংলা একাডেমি যথারীতি অমর একুশে গ্রন্থমেলার আয়োজন করে যেখানে মোট ৪ হাজার ৯১৯ টি নতুন বই প্রকাশিত হয়েছে যা তার আগেরবারের তুলনায় ২৩৪টি বেশি। বিগত ২০১৯ সালের মেলাতে মোট ৮০ কোটি টাকার বই বিক্রি হলেও ২০২০-এ মোট বই বিক্রি ৮২ কোটি টাকার মাইলফলক ছুঁয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন মেলার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় থাকা এবং মানসম্মত বই প্রকাশিত হওয়ার কারণে এই রেকর্ড পরিমাণ বই বিক্রি হয়েছে।

তবে বই প্রকাশের সংখ্যা বাড়লেও কমেছে 'মানসম্মত' বই-এর সংখ্যা। গত ২০১৯ বইমেলায় ১১৫১ টি বইকে মান সম্পন্ন বই বলে মনে করেছে বাংলা একাডেমি অথচ ২০২০ সালে তার পরিমাণ কমে দাঁড়িয়েছে ৭৫১ টি। বই মেলা ছাড়াও বছরের বিভিন্ন সময়েও নানারকম সৃজনশীল বই প্রকাশ করোনার কারণে ব্যাহত হয়েছে।

ফ্যাশন এবং সৌন্দর্য চর্চায় এ বছর মানুষের আগ্রহ তেমন একটা দেখা যায়নি। বছরের অধিকাংশ সময়ই মানুষ ঘরে থাকায় নিত্য-নতুন পোশাক কেনার প্রবণতা কম ছিলো। এছাড়া, বড় বড় শপিং মল বন্ধ থাকায় ও করোনার ভয়ে ঈদ ও পুজাসহ সকল অনুষ্ঠানে কেনাকাটার হার ছিলো অন্যান্য বছরের তুলনায় খুবই কম। কিছু মানুষ করোনার মধ্যেও শপিং বা বিলাসী পণ্য ক্রয় করেছে তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তাদেরকে নিয়ে ঠাট্টা হতে দেখা গেছে। তবে উৎসবগুলিতে কেউ কেউ ঘরে বসে নতুন পোশাক পরে ইন্টারনেটে আপনজনদের সাথে ভারচুয়াল আড্ডা দিয়েছে। এছাড়া, সৌন্দর্য চর্চায় ব্যবহৃত পণ্যের থেকেও স্বাস্থ্য-সুরক্ষা সংশ্লিষ্ট পণ্যে বা প্রসাধনী যেমন হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক, পিপিই, জীবাণু নাশক সাবান, ফেস শিল্ড প্রভৃতির ব্যবহারে মানুষের আগ্রহ ছিলো অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিভিন্ন ডিজাইনের পণ্যের প্রতি মানুষের আগ্রহ ছিলো। বিভিন্ন নকশার মাস্ক অন্যান্য কাপড়ের সঙ্গে ম্যাচিং করে ব্যবহার করতে দেখা গেছে।

গত বছর পহেলা বৈশাখের সকল অনুষ্ঠানকে বন্ধ ঘোষণা করা হয়। করোনার কারণে গতবছর ঢাকায় আন্তর্জাতিক লোকসঙ্গীত উৎসব হয়নি পাশাপাশি সাহিত্যের আন্তর্জাতিক উৎসব 'ঢাকা লিট ফেস্ট'-এর আয়োজনও বন্ধ থাকে। বছরের অধিকাংশ সময় মানুষ ঘরের বাইরে অবকাশ যাপন বা ঘোরাঘুরি করতে পারেনি। পর্যটন খাতের সাথে যুক্ত খাতসমূহ ব্যপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মানুষের উপস্থিতি ক্রমবর্ধমান ছিলো। বছরটিতেই সব থেকে বেশি হারে দেশের তরুন সমাজ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমকে কল্যানকর কাজে ব্যবহার করেছে। প্রথমদিককার করোনা আতঙ্ক কাটিয়ে উঠে বিভিন্ন ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য অর্থ তহবিল গঠন, চাঁদা উঠানো, মানুষের দূর্ভোগের কথা জানানোসহ নানাবিধ জনহীতকর কাজে এই মাধ্যমকে ব্যবহার করেছে তরুনরা। এছাড়া, ধর্ষণসহ অন্যান্য অপরাধের বিরুদ্ধ সামাজিক মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য প্রতিবাদ লক্ষ্য করা গেছে। তবে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সবচেয়ে আলোচিত বিষয়গুলির মধ্যে অন্যতম ছিলো পদ্মা সেতুর সবগুলো স্প্যান বসে যাওয়ার খবরটি। এই দিনে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ ইন্টারনেটে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে এবং প্রধানমন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টদের প্রশংসায় ভাসায়।

করোনা মহামারির মধ্যেও নিরবিচ্ছিন্ন ছিলো ইন্টারনেট সেবা। দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়ায় ১১ কোটি ১১ লাখে। এর মধ্যে মুঠোফোনে ইন্টারনেট ব্যবহারকারী প্রায় ১০ কোটি ২৫ লাখ। করোনা কালে সেবার জন্য সামাজিক মাধ্যমসহ

বিভিন্নভাবে সাধারণ মানুষের প্রশংসায় ভেসেছে আইনশৃংখলা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা বা পুলিশ। তবে কিছু কিছু এলাকায় পুলিশ ও সরকারি কর্মকর্তাদের দ্বারা লকডাউনের মধ্যে সাধারণ কিছু মানুষের অবমাননাকর পন্থায় শাস্তি প্রদান করার ছবি সামাজিক ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে তা সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়।

গত বছর বাংলাদেশের বিনোদন অঙ্গণেও পড়েছিলো করোনার প্রভাব। লকডাউনের কারণে বছরটিতে নাটক সিনেমাসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নির্মাণকাজ বন্ধ হয়ে যায় যদিও পরবর্তীতে 'স্যোশাল ডিসট্যান্সিং' বজায় রেখে, স্বাস্থ্য বিধি মেনে শুটিং শুরু করে। তবে এবছর অধিকাংশ মানুষ যেহেতু লকডাউনে ঘরেই অবস্থান করেছে ফলে সেসময় টিভিতে খবর, নাটক ও সিনেমা অন্যান্য সময়ের চেয়ে বেশি দেখেছে বলে জানা যায়। টিভির তুলনায় অনলাইন বিনোদনে মানুষের আগ্রহ যথারীতি ক্রমবর্ধমান ছিলো।

সিনেমা অঙ্গণে ছিলো হতাশার ছায়া। করোনার কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ ছিলো সিনেমা হলগুলি। বছর শেষে প্রযোজক সমিতির হিসেবে ছবি মুক্তির সংখ্যা ১৬ যা স্বাধীনতার পর সবচেয়ে কম। তবে প্রশংসনীয় কাজও করেছে চলচ্চিত্রের সমিতিগুলো। করোনাকালে সাধারণ শিল্পী ও কুশলীদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছে প্রযোজক, পরিচালক ও শিল্পী সমিতি।

সারা বছর পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন জায়গায় যাত্রাগান, পালা গান বা কাওয়ালী গানের যেসব বড় আয়োজন হয় সেগুলি গতবছরের বেশিরভাগ সময় ধরে আয়োজিত হয়নি তবে বছরের শেষের দিকে কিছু কিছু অঞ্চলে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন দেখা গেছে। বিভিন্ন পীরের আসরে বা দরগাহে ওরস-এর আয়োজনও ব্যহত হয়েছে।

ইউটিউব এবং অনলাইনভিত্তিক মিউজিক ভিডিও, নাটক এবং স্বল্প-দৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র উপভোগ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের মাঝে টেলিভিশিনের তুলনায় ইন্টারনেটেই টিভি অনুষ্ঠানসহ অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান উপভোগ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। টেলিভিশনে করোনার সংবাদই বেশি প্রকাশিত হয়েছে। ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবহার করা যায় এমন টিভি সেটের জনপ্রিয়তা ক্রমবর্ধমান ছিলো। ইন্টারনেটে মুলধারার সঙ্গীতের পাশাপাশি ইসলামিক ওয়াজ-মাহফিলের অনুষ্ঠান এবং সঙ্গীতের চর্চার প্রবণতাও লক্ষ করা গেছে।

বছরটিতে বিনোদন অঙ্গনের কয়েকজন বিশিষ্ট মানুষ মারা গেছেন তাদের মধ্যে খ্যাতিমান অভিনেতা আব্দুল কাদের, আলী যাকের, সাদেক বাচ্চু, কে এস ফিরোজ, সঙ্গীত শিল্পী এন্ড্রু কিশোর, অভিনেত্রী ফেরদৌসি আহমেদ লীনা, প্রমূখ। এদের মধ্যে সাদেক বাচ্চু এবং আলী যাকের কোভিড-১৯ পজিটিভ ছিলেন।

বিগত ২০২০ সাল ছিলো বাংলাদেশের ক্রিড়াঙ্গণে প্রথম বিশ্বকাপ জয়ের বছর। টানটান উত্তেজনার ম্যাচে ভারতকে হারিয়ে যুবারা দেশকে এনে দেন প্রথম অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপ শিরোপা। পরিকল্পনা অনুযায়ী বছরটি ছিলো বাংলাদেশের ক্রিড়াঙ্গণের অন্যতম ব্যস্ত বছর অথচ করোনার কারণে পুরো ক্রিড়াঙ্গণই ছিলো স্থবির। বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বিশ্ব একাদশ ও অবশিষ্ট এশিয়া একাদশের দুটি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ হওয়ার কথা ছিল মার্চে মিরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে। বিশ্ব ক্রিকেটে অনেক বড় তারকার খেলা নিশ্চিত হয়েছিল। সেটি করোনার কারণে স্থগিত হয়ে যায় গত বছরেই। খুব বেশি টেস্ট ম্যাচ না খেলার দর্ঘিদিনের আক্ষেপ ছিলো বাংলাদেশের। সে আক্ষেপ ঘোচাতে গত বছর ১০ টি টেস্ট ম্যাচ খেলার পরিকল্পনা ছিলো।

এমন সুযোগ বাংলাদেশ কখনোই পায়নি। অথচ পুরো বছরে খেলতে পেরেছে মাত্র ২ টি টেস্ট। এছাড়া ওয়ানডে ম্যাচ খেলতে পেরেছে মাত্র ৩টি। এক বছরে এত কম ম্যাচ ১৯৯৫ সালের পর এবারই প্রথম। তবে আরো উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে, গত বছর কোন ওয়ানডে ম্যাচে হারেনি বাংলাদেশ। এছাড়া, এ বছরটিতেই বাংলাদেশের ক্রিড়াঙ্গণের অন্যতম জনপ্রিয় অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা ওয়ানডে অধিনায়কত্ব থেকে বিদায় নেন। এক বছরের নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে নভেম্বরে বঙ্গবন্ধু টি-টোয়েন্টি কাপ দিয়ে আবার ক্রিকেটে ফেরেন বাংলাদেশ ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় তারকা সাকিব আল হাসান। মাশরাফি বিন মুর্তজা, মাহমুদউল্লাহ, মুমিনুল হকসহ বেশ কিছু তারকা করোনা আক্রান্ত হলে দেশে ক্রিড়াপ্রেমিরা দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। পরে অবশ্য তারা সুস্থ হয়ে ফিরেছেন। নারী ক্রিকেটে তেমন কোন অর্জন ছিলোনা বলা যায়। নারী বিশ্বকাপও ভালো যায়নি বাংলাদেশের জন্য। টানা দ্বিতীয়বার ভারতের উইমেন্স টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জে খেলেন জাহানারা আলম। প্রথমবারের মতো এতে অংশ নেন সালমা।

গত বছরে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে আলোচনার শীর্ষে ছিল বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) নির্বাচন। নির্বাচনে টানা চতুর্থবারের মতো সভাপতি পদে বিজয়ী হয়েছেন কাজী মো. সালাউদ্দিন। মাঠের ফুটবল মার্চ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস বন্ধ ছিল। করোনার প্রথম ঢেউ একটু কমলে ফুটবল সীমিত আকারে শুরু হয়। মার্চ ও জুনে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বের বাকি চার ম্যাচ খেলার কথা ছিল বাংলাদেশের তবে তা ৯ মার্চ স্থগিত হয়। এএফসি কাপ, মুজিববর্ষে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপসহ বেশ কিছু প্রীতি ম্যাচও হওয়ার কথা ছিল। জয়া চাকমার পর ফিফা রেফারি হওয়ার স্বীকৃতি পেলেন সালমা। তবে বয়স ২৫ এর নিচে হওয়ায় তিনি থাকছেন সহকারী রেফারি হিসেবে।

তবে খেলোয়াড়েরা খেলাধুলায় ব্যস্ত সময় না কাটাতে পারলেও বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ড করেছেন, মুশফিকুর রহিম তাঁর দুই শতক রান করা বিখ্যাত ব্যাট বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে প্রায় ৩০০ শত দরিদ্র পরিবারকে সহায়তা করেছিলেন। তহবিল গঠনের জন্য সাকিব আল হাসানও ব্যাট বিক্রি করেছিলেন এবং সাকিব আল হাসান ফাউন্ডেশন থেকে সুবিধা বঞ্চিতদের সহায়তা প্রদান করেছেন। এছাড়াও, খেলোয়াড়দের বিভিন্ন সংগঠন থেকে দরিদ্র খেলোয়াড়দের ও সুবিধা বঞ্চিতদেরকে সহায়তা করার খবর জানা গেছে।

করোনার মধ্যে গ্রাম এবং শহরে বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় খেলা যেমন লুডু, দাবা, কেরাম খেলার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। কিছু কিছু অঞ্চলের গ্রামগুলিতে মানুষ বিভিন্ন দোকানে ক্যারম খেলেছে। আবার শহরের মানুষ পরিবারের সদস্যদের সাথে লুডু ও দাবা খেলেছে বলে জানা যায়। তবে, অনেকে ডিজিটাল মাধ্যম অর্থাৎ মোবাইল ও ল্যাপটপের অ্যাপস ব্যবহার করে লুডু ও দাবা খেলেছে। কিছু কিছু মানুষ আবার ইন্টারনেট ব্যবহার করে দূরে অবস্থানরত বন্ধু-বান্ধবের সাথে লুডু, দাবাসহ বিভিন্ন 'গেইম' খেলে সময় কাটিয়েছে।

নারী ও শিশু

২০২০ সালে বিশ্বজুড়ে ছিল করোনা মহামারীর প্রভাব। সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেও সকল ক্ষেত্রে করোনার প্রভাব লক্ষ করা যায়, নারী ও শিশুদের ক্ষেত্রেও যার ব্যতিক্রম হয় নি। যদিও বিগত বছরগুলোর ধারাবাহিকতায় গত বছরেও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশে নারী-পুরুষের সমতা অর্জিত হয়েছে, তবে করোনার প্রভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকায় বাল্য বিবাহ আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বাল্য বিবাহের ক্ষেত্রে বিশ্বে শীর্ষ ১০টি দেশের মধ্যে থাকা বাংলাদেশে জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর মাসে বাল্য বিবাহের হার বেড়েছে ২২০ শতাংশ। এছাড়াও করোনাকালীন সংস্কটে অনেক বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একেবারে বন্ধ হয়ে যাওয়ায় শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার পরিমাণও বৃদ্ধি পাবে যার প্রভাব নারীদের কর্মসংস্থানের উপরেও পড়বে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও নারীর কর্মসংস্থানের সবগুলো খাতেই করোনার প্রভাব সুস্পষ্ট। বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, করোনাকালীন ও এর পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক মন্দার কারনে ৫৩ শতাংশ নারী তাদের কর্মসংস্থান হারিয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন পোশাক শিল্পে কাজ করা নারী শ্রমিকরা। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের হিসাব অনুযায়ী আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রায় এক-চতুর্থাংশ (১ মিলিয়ন) নারী পোশাক শ্রমিক কাজ হারিয়েছেন। এছাড়া অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করা অনেক নারীও তাদের জীবিকা হারিয়েছেন। উইমেন চেম্বারস এন্ড কর্মাস ইন্ডাসট্রির এক হিসাব অনুযায়ী করোনাকালীন লকডাউনের প্রভাবে ৪০ থেকে ৫০ শতাংশ ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তার ঝরে পড়ার আশঙ্কা আছে। ২০২০ সালে নারী উদ্যোক্তাদের মাস্টারকার্ড সূচকেও বাংলাদেশ বিশ্বের ৫৮টি দেশের মধ্যে সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে। বিআইএসআর-এর একটি গবেষণায়ও দেখা যায় করোনার প্রভাবে বেশিরভাগ নারী ক্ষুদ্র উদ্যোক্তারা বিশেষ করে যারা কাপড় ও খাবার বিক্রির সাথে জড়িত তারা তাদের ব্যবসা গুটিয়ে নিয়েছেন। নারী অভিবাসনের ক্ষেত্রেও পড়েছে নেতিবাচক প্রভাব।

বাংলাদেশ মহিলা পরিষদের একটি সমীক্ষায় দেখা যায়, করোনাকালীন ও এর পরবর্তী সময়ে অর্থনৈতিক মন্দার কারনে ৫৩ শতাংশ নারী তাদের কর্মসংস্থান হারিয়েছেন। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন পোশাক শিল্পে কাজ করা নারী শ্রমিকরা। ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশনের হিসাব অনুযায়ী আগস্ট মাস পর্যন্ত প্রায় এক-চতুর্থাংশ (১ মিলিয়ন) নারী পোশাক

করোনার প্রভাব শুরু হওয়ার পর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ৪০ হাজার নারী অভিবাসী (মোট নারী অভিবাসীর ৪.৪৩ শতাংশ) দেশে ফিরে এসেছেন।

করোনাকালীন বাজেটে ভিন্নতা আসায় বিগত অর্থবছরের মত ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটে নারী উন্নয়নে আলাদা করে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট নির্ধারণ করা হয়নি। তবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ১ হাজার কোটি টাকা (মোট প্রণোদনার ৫ শতাংশ) সরকারী প্রণোদনা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়াও দারিদ্র্যপ্রবণ ১০০টি উপজেলায় সব বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত নারীকে ভাতার আাওতায় আনার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

বছরের প্রায় প্রথম থেকেই দির্ঘ লকডাউনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে নারী ও শিশুদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর। স্কুল বন্ধ থাকায় শিশুদের খেলাধুলাসহ অন্যান্য সামাজিক কর্মকান্ড ব্যহত হয় যার প্রভাবে তাদের মধ্যে মানসিক চাপ বেড়ে যায়। লকডাউনে শিশুরাসহ পরিবারের অন্যান্য সদস্যরাও দির্ঘ সময় বাড়ীতে অবস্থান করায় বাড়তি গৃহস্থলী কর্মের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে পরিবারের নারী সদস্যদের উপর। ইউএন উইমেন-এশিয়া এ্যান্ড প্যাসিফিক-এর তথ্যমতে, লকডাউনের সময়ে শতকরা ৬৩ শতাংশ নারীকেই বাড়তি গৃহস্থলী কর্মে অংশগ্রহণ করতে হয়। বিবাহবিচ্ছেদের হারও ছিল উর্ধগামী, ঢাকা উওর ও দক্ষিণ সিটি করপোরেশনের তথ্য অনুযায়ী বিগত বছরের জুন থেকে অক্টোবর পর্যন্ত পাঁচ মাসে ঢাকায় বিবাহবিচ্ছেদ আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় প্রায় ৩০ শতাংশ বেড়েছে। এই সময়ে ঢাকা শহরে দৈনিক বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা ছিল ৩৯টি।

লকডাউনে অনেক কিছু থেমে থাকলেও থেমে ছিলনা নারী ও শিশু ধর্ষণ। আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক)-এর তথ্য অনুযায়ী বিগত বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে ৯৭৫ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এর মধ্যে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২০৮ জন। এছাড়া ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছেন ৪৩ জন এবং আত্নহত্যা করেন ১২ জন নারী। এছাড়াও এই ৯ মাসে পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৪৩২ জন নারী। এর মধ্যে হত্যার শিকার হন ২৭৯ জন নারী এবং পারিবারিক নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যা করেছেন ৭৪ জন নারী। শিশু নির্যাতন ও হত্যার দিক দিয়েও এই ৯ মাসের পরিসংখ্যান অত্যন্ত উদ্বেগজনক। এসময়ে ১ হাজার ৭৮ জন শিশু শারীরিক নির্যাতনসহ নানা সহিংসতার শিকার হয়। এছাড়া ৬২৭টি শিশু ধর্ষণ ও ২০টি বলাৎকারের ঘটনা ঘটে।

২০২০ সালে অনেক ক্ষেত্রে নারীরা পিছিয়ে পড়লেও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে এগিয়ে ছিল বাংলাদেশ। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের জেন্ডার গ্যাপ ইনডেক্স অনুসারে বিশ্বের ১৫৩টি দেশের মধ্যে ৫০তম স্থান নিয়ে নারীদের সামগ্রিক ক্ষমতায়নে দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষ অবস্থানে ছিল বাংলাদেশ। এর মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল সপ্তম। তবে রাজনৈতিক উপসূচক গুলোতে নারীর অবস্থান খুব বেশি উন্নত হয় নি, যেমন- সংসদে নারীর অংশগ্রহণের উপসূচকে বাংলাদেশ ৮৬তম এবং মন্ত্রীর সংখ্যার উপসূচকে ১২৪তম অবস্থানে ছিল।

বিগত বছরে আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশী নারীদের বেশ কিছু সাফল্যও বছর জুড়ে আলোচনার বিষয় ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ফোর্বস সাময়িকীর ২০২০ সালে বিশ্বের সবচেয়ে ক্ষমতাধর নারীর তালিকায় ৩৯তম স্থানে ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বিবিসির প্রভাবশালী ১০০ নারীর তালিকায়ও জায়গা করে নেন দুজন বাংলাদেশী নারী। করোনাভাইরাস মহামারির সময়ে যৌনকর্মীদের খাবারের বন্দোবস্ত করায় রিনা আক্তার ও রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক উন্নয়নে অবদান রাখায় রিমা সুলতানা এই তালিকায় স্থান পান। এছাড়াও বাংলাদেশের নারী বিজ্ঞানী ড. ফিরদৌসি কাদরি ২২তম ল'রিয়েল-ইউনেস্কো ফর ওমেন ইন সায়েন্স অ্যাওয়ার্ড অর্জন সবার দৃষ্টি কাড়ে। ফিরদৌসি আইসিডিডিআর'বির মিউকোসাল ইমুনলজি অ্যান্ড ভ্যাকসিনোলজি ইউনিট অব ইনফেকসিয়াস ডিজিসেস ডিভিশনের প্রধান। উন্নয়নশীল দেশের শিশুদের সংক্রামক রোগ সম্পর্কে গবেষণার জন্য তিনি এই সম্মাননা পেয়েছেন।

২০২০ নারী টি-২০ বিশ্বকাপে খেলার সুযোগের সুখবর নিয়ে দেশের নারী খেলোয়াড়রা বছরটি শুরু করলেও বিগত বছরে নারী খেলোয়াড়দের বড় কোন অর্জন ছিল না। টি-২০ বিশ্বকাপে গ্রুপ পর্বের সব ম্যাচ হেরে শূন্য হাতে বিদায় নেয় নারী ক্রিকেট দল। তবে ভারতের উইমেন্স টি-টোয়েন্টি চ্যালেঞ্জে দ্বিতীয়বারের মত অংশগ্রহণ করেন অলরাউন্ডার জাহানারা আলম এবং ট্রেইলব্লেজার্সের শিরোপা জয় করেন যেটি ক্রিকেটপ্রেমীদের মনে কিছুটা হলেও আনন্দের সঞ্চার করে।

অর্থনৈতিক পর্যালোচনা

আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের অর্থনীতি বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল অর্থনীতির দেশ (তৃতীয়) এবং দক্ষিণ এশিয়ার সবচেয়ে দ্রুততম ক্রমবর্ধমান প্রধান অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে যা গত এক দশক ধরে গড়ে জিডিপি-এর ৬.৫% প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে। মোট দেশজ উৎপাদন (জিডিপি) এর ভিত্তিতে বাংলাদেশ বিশ্বে ৩৫ তম (নমিনাল) এবং ২৯তম (পিপিপি) স্থান অর্জন করেছে যা বিগত অর্থবছরে ছিল ৩৯ তম (নমিনাল)। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (২০২০) এর সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশের মোট জিডিপির পরিমাণ ৩১৮ (নমিনাল) বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৪.৯% বেশি।

জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্যানুযায়ী, ২০২০ সালে পাট উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে ২য় হলেও রপ্তানিতে প্রথম, ধান ও আলু উৎপাদনে যথাক্রমে ৪র্থ ও ৭তম, সবজি ও মাছ উৎপাদনে তৃতীয়, চা উৎপাদনে ৯তম এবং গবাদিপশু পালনে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে দ্বাদশ অবস্থানে রয়েছে। সবচেয়ে বিস্ময়কর বিষয় হচ্ছে, বিশ্বে যে পরিমাণ ইলিশ উৎপাদন হয়, তার ৮৬ শতাংশই হয় আমাদের বাংলাদেশে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ৫.২৪% এ পৌঁছেছে যা ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ছিল ৮.১৫% (বাংলাদেশের এই প্রবৃদ্ধির হার ছিল স্বাধীনতার পর সর্বোচ্চ)। পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত, মোট দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি ও অগ্রগতিতে প্রধান অবদান রেখেছে সেবা, শিল্প ও কৃষি খাত যথাক্রমে ৫১.৩০%, ৩৫.৩৬% এবং ১২.৩৫% যা বিগত অর্থবছরে ছিল যথাক্রমে ৫১.৩৫%, ৩৫.০০% এবং ১৩.৬৫%।

> **২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বিগত বছরের তুলনায় কম হলেও, মাথাপিছু আয়ের উন্নতি হয়েছে। বিগত অর্থবছরে (২০১৮-১৯) মাথাপিছু আয় ছিল ১৭৫২ মার্কিন ডলার, যা জুলাই ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে ২০৬৪ মার্কিন ডলার হয়েছে; মাথাপিছু আয়ের রেকর্ডে যা এ যাবত সর্বোচ্চ।**

বিবিএস-এর তথ্য অনুসারে, ২০১৯-২০ অর্থবছরে, জিডিপির শতাংশ হিসাবে দেশে এখন মোট খরচ ব্যয় দাঁড়িয়েছে ৭৪.৬৯%, মোট জাতীয় সঞ্চয়ের পরিমান ৩০.১১% যা বিগত অর্থবছরে ছিল ২৯.৫০% এবং মোট বিনিয়োগের পরিমান ৩১.৭৫% (ব্যক্তিখাত ২৩.৬৩% + সরকারি খাত ৮. ১২%) যা বিগত অর্থবছরে ছিল ৩১.৫৭%। বছরটিতে মোট বিদেশি বিনিয়োগের পরিমান ২.৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত অর্থবছরের তুলনায় ৩৯.৫৯% কম এবং বিশ্বের ০.২৯% যেখানে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা বিশ্বের ২.১১%। বিআইএসআর মনে করে যে, বাংলাদেশে আরও অধিক পরিমান বিদেশি বিনিয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে যদি ব্যবসায়িক এবং বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়।

বছরটিতে মোট রপ্তানির পরিমাণ ছিলো প্রায় ৩৩.৬৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা বিগত বছরের তুলনায় ১৬.৯২ শতাংশ কম এবং মোট আমদানির পরিমান ৪৬.২৪ বিলিয়ন ডলার যা বিগত বছরের তুলনায় ১৬.৫৯ শতাংশ কম। ২০১৯-২০ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বিগত বছরের তুলনায় কম হলেও, মাথাপিছু আয়ের উন্নতি হয়েছে। বিগত অর্থবছরে (২০১৮-১৯) মাথাপিছু আয় ছিল ১৭৫২ মার্কিন ডলার, যা জুলাই ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়ে ২০৬৪ মার্কিন ডলার হয়েছে; মাথাপিছু আয়ের রেকর্ডে যা এ যাবত সর্বোচ্চ।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর লেবার ফোর্স সার্ভের (মার্চ, ২০১৭) তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশে মোট ৬৩.৫ মিলিয়ন (পুরুষ ৪৩.৫ মিলিয়ন এবং মহিলা ২০ মিলিয়ন) শ্রম শক্তির মাঝে ২.৭ মিলিয়ন জনবল বেকার রয়েছে যা মোট শ্রম শক্তির প্রায় ৪.২৫%। বিশ্বব্যাংকের ডিসেম্বর, ২০২০ এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের বেকারত্বের হার প্রায় ৪.১৫% যা ২০১৯ সালে ছিল ৪.১৯%। যদিও গত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে বেকারত্ব বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান একটি সমস্যা, তথাপি ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বেকারত্ব কমানোর বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো পরিকল্পনা নেই। বিআইএসআর এর পরামর্শ হলো, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় করোনা পরবর্তী অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে, কর্মসংস্থান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সৃজনশীল পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়নযোগ্য কর্মকৌশল আরো সুসংগঠিত ও সুবিন্যাস্ত উপায়ে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। বিআইডিএস এর (এপ্রিল, ২০১৯) গবেষণা অনুসারে, বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকদের মধ্যে বেকারত্বের হার ৩৮.৬ শতাংশ। করোনার প্রভাবে বাংলাদেশে যুব বেকারত্বের হার বেড়ে দ্বিগুণের বেশি হতে পারে বলে আশঙ্কা করেছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও)।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সর্বশেষ প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে বাংলাদেশের দারিদ্র্যের হার ১৮.০৬% যা ২০১৯ সালে ছিল ১৯.১৮% কিন্তু করোনার প্রভাবে ২০২১ সালে এসে ৩-৫% বাড়তে পারে। মানুষ চরম দারিদ্র্য সীমার নিচে রয়েছে প্রায় ৮.৯% যা গত বছর ছিল প্রায় ৯.৭%(- ০.৮%)।

তবে দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রগতি হলেও সারা পৃথিবীর মধ্যে বাংলাদেশে ধনী শ্রেণীর সংখ্যা দ্রুততম বৃদ্ধির ফলে আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে। সামাজিক খাতে উন্নয়ন সত্ত্বেও বাংলাদেশে আয়বৈষম্য প্রকট। দেশের গরিব ৪০ শতাংশের আয় মোট আয়ের মাত্র ২১%, ১ম ১০% শীর্ষ ধনীদের কাছে ২৭% আয় চলে যায়, আর শেষ ১০% মানুষের কাছে পৌঁছায় ৩.৮% আয়। অর্থাৎ শীর্ষ ১০% ধনী শেষ ১০% -এর তুলনায় প্রায় ৮ গুণ বেশী আয় করেন। যার ফলে মোট দেশজ উৎপাদন/আয় বৃদ্ধি পেলে তার সুফল সাধারণ মানুষের নিকট কম পৌঁছায়। ইউএনডিপির ২০২০ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের গিনি সূচকের পয়েন্ট ০.৪৭৮। কোনো দেশের এই স্কোর ০.৫০ এর ঘর পেরোলেই উচ্চ বৈষম্যের দেশ হিসেবে ধরা হয়।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী সরকারের কর আরোপের ফলে বিগত অর্থবছরের মত চলতি অর্থ বছরে সঞ্চয়পত্রের প্রতি জনগণের আগ্রহ কমেছে। সঞ্চয়পত্রের উপর চাপ কমাতে এবং ঋণের অতিরিক্ত বোঝা থেকে বাঁচতে এটির উপরে কর আরোপ করেছে সরকার।

গড় মূল্যস্ফীতি বৃদ্ধি পেয়ে বছরটিতে প্রায় ৫.৭৩ শতাংশ হয়েছে যা বিগত বছর ছিল ৫.৫ শতাংশ। পেঁয়াজ, আলু সহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসমূহ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রীর অতিরিক্ত দাম বৃদ্ধি ছিল বহুল আলোচিত।

পোশাক শিল্পের পর চামড়া এবং পাট বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় শিল্পের মধ্যে অন্যতম। এ বছর শিল্পদ্বয়ের তেমন কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি বরং বাংলাদেশ রাষ্ট্রয়াত্ত ২৫টি পাটকল বন্ধ ঘোষণা করে প্রায় ২৫ হাজার শ্রমিককে অবসরের পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে সরকার। এর মধ্য দিয়ে মূলত রাষ্ট্রয়াত্ত পাটকল যুগের অবসান ঘটলো। পূর্ববর্তী বছরগুলোর মত, পবিত্র ঈদুল আজহার পূর্বে চামড়ার দাম ঠিক করা হলেও বেশির ভাগ চামড়া নামমাত্র দামে বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছে সাধারণ জনগণ।

বিশ্বমন্দায় অর্থনীতি, আমদানি এবং রপ্তানিতে স্থবিরতা, কর্মসংস্থানের অভাব, ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব ও দারিদ্র্যের পরিপ্রেক্ষিতে একটি বাজেট তৈরি করা ছিল সরকারের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ। চলতি অর্থ বছরের বাজেট প্রস্তাবে বরাবরের মত বাজেট ঘাটতি বিদ্যমান রয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট বাজেটের পরিমাণ ধরা হয়েছে ৫,৬৮,০০০ কোটি টাকা যা বিগত অর্থবছরের (২০১৯-২০) তুলনায় ৮.৫৬% বেশি এবং মোট জিডিপির ২০.৭৫ শতাংশ। উন্নয়ন বাজেট ২,১৫,০৪৩ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৩৭.৮৬ শতাংশ এবং ঘাটতি বাজেট ১,৯০,০০০ কোটি টাকা যা মোট বাজেটের ৩৩.৪৫ শতাংশ।

এই অর্থ বছরেও বাজেট প্রস্তুতির পদ্ধতিতে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি যদিও বিআইএসআর দীর্ঘদিন ধরে চাহিদা ভিত্তিক বাজেট তৈরীর বিষয়ে প্রস্তাব দিয়ে আসছে। চাহিদা ভিত্তিক বাজেট তৈরী না হওয়ার ফলে অর্থ অপচয়ের বা অব্যবহৃত থাকার সুযোগ থেকে যাচ্ছে যা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পর সাধারণ মানুষ তা নিয়ে মাঝে মাঝে আলোচনা করে। বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন এর বাংলাদেশ অগ্রগতি রিপোর্ট ২০২০ বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে বৈদেশিক সাহায্যের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা কমেছে। দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী হওয়ায় বৈদেশিক সহায়তায় অনুদানের পরিমাণ কমে ৩.১৫ শতাংশে নেমেছে এসেছে যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ছিল সর্বোচ্চ প্রায় ৫ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংক-এর সর্বশেষ তথ্য (নভেম্বর, ২০২০) অনুযায়ী, বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে ২৯.৪৬%। মোট বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভের পরিমাণ ৪১,০৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা ২০১৯ সালে ছিল ৩১,৭২৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। রেমিট্যান্সকে বর্তমানে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মূল চালিকা শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক এর সর্বশেষ তথ্য (নভেম্বর, ২০২০) অনুযায়ী, বাংলাদেশে ২০২০ সালে মোট রেমিট্যান্স প্রবাহের পরিমাণ ১৯.৬৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার যা এ যাবত সর্বোচ্চ এবং ২০১৯ সালের তুলনায় প্রায় ২০.০৬% বেশি। বাংলাদেশ এখন নয় মাস পণ্য আমদানি করার সক্ষমতা অর্জন করেছে যা প্রয়োজনের তুলনায় (সর্বনিম্ন তিন মাসের আমদানির সক্ষমতা) ৩ গুণ বেশি। এখন প্রয়োজন আয় বৃদ্ধিতে বৈদেশিক রিজার্ভ-এর সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা। বিএমইটি (মে, ২০২০ পর্যন্ত) অনুসারে, মোট ১৮১২১৮ জন শ্রমিক (নারী শ্রমিকের সংখ্যা ১৮,৮১৩) বাংলাদেশ থেকে বিদেশে গিয়েছে কর্মসংস্থানের জন্য যা বিগত বছরের ছিল ৬০৪০৬০।

২০২০ সালে, শেয়ার বাজারের বন্টন চিপ ইনডেক্সের সূচক অনুযায়ী, ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ২০১৩ সালের পর থেকে সর্বনিম্ন সূচক অর্জন করেছে। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের গ্লোবাল কম্পেটিটিভনেস ইনডেক্স (জিসিআই) ২০১৯ অনুসারে, সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা, শ্রম বাজারের অবস্থার অবনতি, আইসিটি ব্যবহারের অভাব এবং অবকাঠামোগত অপর্যাপ্ত অগ্রগতির কারণে ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা করার সক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে এবং ব্যবসায়িক পরিবেশ নিশ্চিত করার বিষয়ে বিশ্বের ১৪১ দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান এবছরে কিছুটা অবনতি হয়ে ১০৫ দাঁড়িয়েছে কিন্তু ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ১০৩ পৌঁছাবে বলে ট্রেডিং ইকোনমিকস গ্লোবাল ম্যাক্রো মডেল এবং বিশ্লেষকরা এমনটাই আশা করছে।

অর্থ পাচার কিছুটা কমলেও, খেলাপী ঋণ বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের বিষয়সমূহের মধ্যে অন্যতম। ২০১৯ সালের সেপ্টেম্বরে মোট খেলাপী ঋণের পরিমাণ ছিল ২,৪০,১৬৭ কোটি টাকা যা ২০২০ সালের ডিসেম্বরে এর পরিমাণ আরো ৯-১০% বৃদ্ধি পেতে পারে। সরকারি প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও খেলাপি ঋণ আদায়ের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কোন অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়নি। কেন্দ্রীয় ব্যাংক খেলাপী ঋণের সঠিক পরিমাণ প্রকাশ করতে বললেও বেশিরভাগ ব্যাংক তা গোপন করার চেষ্টা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এ বছর রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলির খেলাপী ঋণের পরিমাণ সর্বাধিক ছিল, তবে কিছু বেসরকারি ব্যাংকেরও ২০২০ সালে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খেলাপী ঋণ ছিল। অকার্যকর, ঋণ বৃদ্ধি ও পুঁজির অপর্যাপ্ততা এসব ব্যাংকগুলির স্বাভাবিক কার্যক্রমকে ব্যাহত করছে। রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর ক্ষতিপূরণের জন্য সরকারকে জনগণের করের টাকা থেকে খরচ করতে হয়, যা দীর্ঘায়িত হলে করদাতারা নিরুৎসাহিত হতে পারেন।

ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গ্লোবাল ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেগ্রিটি (জিএফআই) এর বার্ষিক প্রতিবদনে বলা হয়েছে, ২০১৫ সালে বাংলাদেশ থেকে প্রায় ৫০ হাজার কোটি টাকা পাচার হয়েছে এবং বিগত দশ বছরে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে ৫ লাখ ৩০ হাজার কোটি টাকা।

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপির ২০২০ সালের মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন অনুযায়ী, ১৮৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান দুই ধাপ এগিয়ে ১৩৩তম। অগ্রগতি সত্ত্বেও সার্বিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থানের পরিবর্তন হয়নি। বিগত বছরের মতো আট দেশের মধ্যে বাংলাদেশ পঞ্চম, শীর্ষে আছে শ্রীলঙ্কা। বিআইএসআর মনে করে যে, রাজনৈতিক সৎইচ্ছা এবং দৃঢ় অঙ্গীকার থাকলে খুব অল্প সময়ের ব্যাবধানে মানব উন্নয়নে আরো কয়েকধাপ উন্নতি করা সম্ভব।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রতিবেদন অনুসারে, চলতি বছরের আগস্টের শেষে, দেশে ই-কমার্স ব্যবসা-বাণিজ্যের বাজার ছিল ১৬৬.১৬ বিলিয়ন টাকা যা ২০১৬ ছিল মাত্র ৫.৬০ বিলিয়ন টাকা মাত্র । গত পাঁচ বছরে দেশের ই-কর্মাস ব্যবসার প্রবৃদ্ধি হয়েছে প্রায় ৩০ গুণ। ২০১৬ সাল থেকে আগস্ট পর্যন্ত এই ব্যবসার প্রবৃদ্ধি হয়েছে গড়ে ২৯ দশমিক ৬৭ শতাংশ।

উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসাবে, অনেক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী ডিজিটালাইজেশন এবং প্রযুক্তিগত বিকাশের জন্য বাংলাদেশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়েছে। ডিজিটাল আউটসোর্সিংয়ের জন্য, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের অন্যতম পথিকৃৎ। বাংলাদেশের আইসিটি বিভাগের তথ্য অনুযায়ী প্রতিবছর বাংলাদেশে মোট আউটসোর্সিং প্রবাহের পরিমাণ ১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অক্সফোর্ড ইন্টারনেট ইনস্টিটিউট (ওআইআই, ২০১৯) অনুসারে, বাংলাদেশ ইতোমধ্যে অনলাইনে শ্রমের দ্বিতীয় বৃহত্তম সরবরাহকারী দেশে পরিণত হয়েছে। এই সম্ভাবনাময় প্রযুক্তি নির্ভর খাতে, বাংলাদেশে বর্তমানে ফ্রিল্যান্সার হিসাবে নিয়মিত কাজ করছে অর্ধ-মিলিয়নেরও বেশি যুবক।

২০২০ সাল ছিল সক্ষমতা প্রমানের বছর। মহামারী করোনা ভাইরাস, ৩১ জেলায় বন্যা, ঘূর্ণিঝড় আমফানসহ নানাবিধ প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে, বাংলাদেশ অর্থনেতিক প্রবৃদ্ধির ইতিবাচক ধারা অব্যাহত রেখেছে।

রাজনীতি

বছরটির প্রায় চারভাগের তিনভাগ সময় কেটেছে কোভিড-১৯ এর সাথে। ফলে এ বছরের রাজনীতি অন্য বছরের স্বাভাবিক রাজনীতির মতো ছিলনা। তবে কোভিড নিয়ে যে কোনো রাজনীতি হয়নি তা নয়। আবার এ কোভিডের কারণে এ বছরটিতে দেশের স্বাস্থ্য বিভাগের অস্বচ্ছতা ও অক্ষমতা সারা দেশে বেশি আলোচিত হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের প্রস্তুতির সীমাবদ্ধতাও দেশের মানুষের মনে ব্যাপক হতাশা তৈরি করে যা ধীরে ধীরে কমে যায়।

বছরটিতে তেমন নতুন কোনো রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় নি। তবে জাতীয় পার্টি ও বিএনপি বেশ কিছুটা সময় অশান্ত ছিল। দেশে নতুন কোনো দল তৈরি হওয়ার মতো বা কোনো প্রধান দলের মধ্যে ভাঙ্গন হয়ে নতুন দল তৈরি হয়নি। বছরটিতে বিএনপি প্রধান আদালত কতৃক সাজাপ্রাপ্ত হওয়ার পরও স্বাস্থ্যগত কারণে সরকারের বিশেষ বিবেচনায় জামিনে সীমিত সময়ের জন্য মুক্ত হতে পেরেছেন। আন্দোলনে বিরোধী দলগুলো সরকারের বিরুদ্ধে তেমন কোনো সফলতা দেখাতে পারেনি। সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের মধ্যে অনেক অসন্তোষ থাকলেও তা ন্যূনতম কাজে লাগাতে পারেননি। রাজনীতির মাঠে নতুন কোনো মেরুকরণ দেখা যায় নি।

> *কোভিড -১৯ এর জন্য ডাক্তার এবং পুলিশ বেশি জীবন দিলেও তাদের অন্য সহকর্মীদের কারণে সকলে প্রশংসা পেতে ব্যর্থ হন। এ সব নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনা দেখা গেলেও সরকার কোনো রাজনৈতিক সংকটে পড়েনি, দেশে কোনো রাজনৈতিক ঝড় সৃষ্টি হয়নি।*

প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের জনপ্রিয়তা বাড়েনি বরং কিছুটা কমেছে বলে বলা যায়। সারা বছর আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার জনপ্রিয়তা উর্ধ্বমূখী বজায় থাকলেও বছরের একটি সময় দেশে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির কথা প্রকাশ পাওয়ার পর তার জনপ্রিয়তা কিছুটা হলেও হ্রাস পায়। ব্যাংকিং খাতে মন্দ ঋণের প্রবাহ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়া, মন্দ ঋণ আদায় করতে ব্যর্থ হওয়া প্রভৃতি কারণে

শাসক দলকে আরো প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছিল। এসব কারণে জনপ্রিয়তায় বেশ কিছু হলেও ধ্বস নামে। দুর্নীতির বিষয়ে কিছু পদক্ষেপ থাকলেও তা মানুষকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ক্ষমতার সাথে জড়িত বিভিন্ন শ্রেণী এবং পেশার মানুষকে আইনের আওতায় আনতে না পারায় জনগণের মধ্যে ক্ষোভ অব্যাহত থাকে। মাদকের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান চালিয়ে কিছুটা প্রশংসা পেলেও মেজর সিনহা হত্যাসহ বিভিন্ন কারণে তা অনেকটা ম্লান হয়ে যায়। কোভিড -১৯ এর জন্য ডাক্তার এবং পুলিশ বেশি জীবন দিলেও তাদের অন্য সহকর্মীদের কারণে সকলে প্রশংসা পেতে ব্যর্থ হন। এ সব নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনা দেখা গেলেও সরকার কোনো রাজনৈতিক সংকটে পড়েনি, দেশে কোনো রাজনৈতিক ঝড় সৃষ্টি হয়নি।

এ অবস্থাকে বিরোধী দলগুলো (সবাক, নির্বাক, মৃদুভাষী কিংবা সংসদের ও মাঠের) কেউ কাজে লাগাতে পারেনি, বলা চলে তাদেরকে শুধু ওয়ার্ম-আপ করার চেষ্টা করতে দেখা গেছে। তারা কোনো বিকল্প রাজনীতি হাজির করতে পারেনি। এ বছরটিতেও শাসক দলের চাপের রাজনীতির বিপক্ষে কোনো সৃজনশীল রাজনীতি উপহার দিতে পারেনি যা শাসক গোষ্ঠীকে বেকায়দায় ফেলতে পারে। তারা নিজেরা নিজেদের অবিশ্বাস ও সংকট নিয়ে বেশি বেকায়দায় দিন কাটিয়েছেন।

বেগম জিয়া রোগের সাথে লড়ে গেছেন, দলের নেতারা দলের এবং দেশের জন্য বেশি লড়েছেন। তবে সাধারণ মানুষ তাতে তেমন সাড়া দেননি। ক্ষুদ্র দলের বৃহৎ নেতারা সারা বছর আলোচনায় থাকলেও রাজনীতিতে তেমন কোনো অর্জন দেখাতে পারেননি। বিরোধী রাজনীতির ক্ষেত্রে এক বড় শূন্যতা থাকলেও তারা তা পূরণ করতে পারেননি। বছরটিতে কোনো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক নেতা হত্যার শিকার হননি। দেশে উল্লেখযোগ্য কোনো গুরুতর রাজনৈতিক সংঘাত ঘটেনি।

বছরটিতে সংবিধানের কোনো সংশোধনী আনা হয়নি। শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগের মধ্যে কোনো টানাপোড়ন ছিলনা। রাজনৈতিক ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে পারে, তেমন কোনো আইনও প্রণয়ন করা হয়নি। সড়ক আইন চালু করার পর কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। বিরোধী শিবিরের একটি অংশ আগাম বা মধ্যবর্তী নির্বাচনের দাবী জানালেও তা তেমন কোনো শক্তিশালী দাবী হিসাবে রূপ পায়নি। বছরটিতে কোনো বড় ধরনের হরতাল বা অবরোধ ছিলনা।

বছরের শেষ দিকে এসে ভাস্কর্য নিয়ে রাজনীতির মাঠে কিছুটা উত্তাপ সৃষ্ঠি হয় কিন্তু তা ব্যাপকভাবে তেমন কোনো বিরোধের সৃষ্টি করতে পারেনি। উভয় পক্ষ মোটামুটি সংযত আচরণ করার ফলে তাতে তেমন কোনো রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়নি।

মন্ত্রী সভার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। সারা বছর ফেসবুকে অনেক গুঞ্জন ছড়ালেও তার কোনো সত্যতা মিলেনি, মানুষ তেমন কোনো গুরুত্ব দেয়নি। রাজনৈতিকভাবে এ বছরটি ছিল অনেক সাদামাটা।

অপরাধ

বছর জুড়েই (২০২০) গতানুগতিক অপরাধ- যেমন খুন, অপহরণ, নারী ও শিশু নির্যাতন, ডাকাতি, ছিনতাই, মাদক ও সোনা চোরাচালান, গণ-উপদ্রব, ইত্যাদি কম-বেশি ঘটেছে। তবে করোনা মহামারীর কারণে অপরাধের প্রকৃতি ও গতিবিধি আগের বছরগুলোর তুলনায় আলাদা ছিল। সারা বছর জুড়েই কোন-না-কোনও অপরাধ বা কেলেঙ্কারীর ঘটনা বেশ আলোচনার সৃষ্টি করেছিল। এর মধ্যে ধর্ষণ, খুন, ত্রাণ আত্মসাৎ, জালিয়াতি ও প্রতারণা, কোয়ারেন্টাইন ভঙ্গ, ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

করোনাকালে পারিবারিক পরিসরে নারীর প্রতি সহিংসতা অনেক বেড়েছে বলে বিভিন্ন গবেষণায় ওঠে এসেছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, চলতি বছর জানুয়ারি থেকে নভেম্বর পর্যন্ত মোট ১১ মাসে পারিবারিক নির্যাতন, অ্যাসিড নিক্ষেপ, যৌন হয়রানি, যৌতুক ও ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ২ হাজার ২৪৬ নারী। এবছরটিতে অপরাধ সংঘটনে বেশ কিছু অভিনব কৌশল দেখা গেছে। অপরদিকে জনসাধারণকে সংঘটিত অপরাধের প্রতিবাদে অনলাইন ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশি সোচ্চার হতে দেখা গেছে।

বাংলাদেশে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে করোনা আতঙ্ক ও সতর্কতামূলক কর্মসূচির প্রভাবে অপরাধের ঘটনা কমে যায়। কেবল রাজধানী ঢাকাতেই এপ্রিলে মার্চ মাসের তুলনায় মামলার সংখ্যা ৮৩ শতাংশ কমেছিল। কিন্তু মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আবারও অনেক নৃশংস অপরাধ ঘটার খবর গণমাধ্যমে এসেছে।

এ বছরের শুরুতেই জানুয়ারি মাসে এক ভবঘুরে কর্তৃক কুর্মিটোলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্রী ধর্ষণের ঘটনাটি বেশ আলোচিত ছিল। তা ছাড়া ফেব্রুয়ারি মাসে এক নারী নেত্রীর ব্লাকমেইলসহ নানা অপরাধ গণমাধ্যমে প্রচার হলে দেশজুড়ে বেশ আলোচিত হয়।

বাংলাদেশে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে করোনা আতঙ্ক ও সতর্কতামূলক কর্মসূচির প্রভাবে অপরাধের ঘটনা কমে যায়। কেবল রাজধানী ঢাকাতেই এপ্রিলে মার্চ মাসের তুলনায় মামলার সংখ্যা ৮৩ শতাংশ কমেছিল। কিন্তু মে মাসের প্রথম সপ্তাহে আবারও অনেক নৃশংস অপরাধ ঘটার খবর গণমাধ্যমে এসেছে। অর্থের অভাব থেকে নতুন নতুন অপরাধ, লুটপাট বা আত্মহত্যা বাড়ার আশঙ্কার কথা বলা হলেও, সেটি তেমনটা পরিলক্ষিত হয়নি। সংকটকে কেন্দ্র করে পণ্য মজুদ, কালোবাজারি ও চড়া দামে বিক্রি করে অধিক মুনাফা অর্জনের প্রবণতা ব্যবসায়ীদের মধ্যে বেড়েছিল। তবে সেটি ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে ছিল। অনলাইন কেনাকাটার চাহিদা বেড়েছে, ফলে প্রতারক চক্রের ফাঁদও বিশেষত স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী বিক্রির ভুয়া বিজ্ঞাপন বেড়েছিল। করোনাকালে স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রীর চাহিদা বেড়ে যাওয়ার দরুন নকল পিপিই, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মানহীন ও এমনকি ব্যবহৃত মাস্ক পুনরায় বাজারে এসেছিল বলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা যায়। করোনাকালে ত্রাণসামগ্রী আত্মসাতের প্রবণতা কিছুটা বেড়েছিল যা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতায় অনেকাংশেই নিয়ন্ত্রণে ছিল। বছরটির প্রথমার্ধে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা না পেয়ে সাধারণ রোগীর অবহেলা জনিত মৃত্যুর অনেক অভিযোগ ছিল। করোনাকালে বিশেষ অপরাধগুলো বেড়ে যাওয়ার পর ব্যাপক সচেতনতামূলক প্রচারণা ও অন্যান্য কারণে পুণরায় কমেছিল। করোনা ভাইরাস পরিস্থিতিতেও দু'জন ব্যবসায়ী ব্যাংক থেকে ঋণ নেওয়ার ইস্যুতে দুই শীর্ষ ব্যাংক কর্মকর্তাকে গুলি করার হুমকি ও নির্যাতনের অভিযোগ থাকায় তা বেশ আলোচিত হয়। মানবপাচার ও ভিসা বাণিজ্যের অভিযোগে কুয়েত সিআইডি কর্তৃক এক সংসদ সদস্যকে আটকের ঘটনাটি বেশ আলোচিত হয়।

কোভিড পরীক্ষা কেন্দ্রীক যে সব অপরাধ ঘটে তন্মধ্যে জেকেজি হেলথকেয়ারের পরীক্ষা না করেই কোভিড-১৯'এর ভুয়া ফলাফল প্রদানের ঘটনা গণমাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই জালিয়াতির সঙ্গে সরকারি মেডিকেল কলেজের একজন মহিলা ডাক্তারের সম্পৃক্ততা বেশ আলোচিত হয়। একইভাবে রিজেন্ট হাসপাতাল কর্তৃক টেস্ট না করেই করোনাভাইরাস পরীক্ষার ভুয়া রিপোর্ট প্রদান এবং বিনামূল্যে পরীক্ষার পরিবর্তে অর্থ গ্রহণের ঘটনা গণমাধ্যমে আসলে তা বেশ আলোচিত হয়। এমনকি জালিয়াতির এই ঘটনা দু'টি বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বিদেশের গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়।

কক্সবাজারের একটি পুলিশ চেকপোস্টে পুলিশের গুলিতে নিহত হন অবসরপ্রাপ্ত মেজর সিনহা মো: রাশেদ। এ ঘটনায় তৎকালীন টেকনাফ থানার ওসির সরাসরি সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হলে দেশে আলোচিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে সিলেট এমসি

কলেজে স্বামীর সঙ্গে বেড়াতে যাওয়া এক তরুণীকে তুলে নিয়ে ছাত্রাবাসে গণধর্ষণের ঘটনা বেশ সমালোচনার সৃষ্টি করে। এই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই অক্টোবর মাসে নোয়াখালীর বেগমগঞ্জে বাড়িতে ঢুকে এক নারীকে বিবস্ত্র করে নির্যাতনের ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। ধর্ষণের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের মুখে সরকার আইন পরিবর্তন করে ধর্ষণের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যু দণ্ডের বিধান করে। 'শত কোটি টাকার মালিক স্বাস্থ্য অধিদফতরের গাড়িচালক' খবরটি সরকারি অফিসে সংঘটিত দুর্নীতির বিষয়টি আবারও আলোচনায় নিয়ে আসে।

অক্টোবর মাসে সিলেটের কোতোয়ালি থানার বন্দরবাজার পুলিশ ফাঁড়ির এক এসআই অনৈতিকভাবে দশ হাজার টাকা আদায় করতে রায়হান নামের এক যুবককে নির্যাতন করার ফলে মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ঘটনায় সারাদেশের মানুষ প্রতিবাদ জানায়। বছরের শেষে দিকে এসে রংপুরে পুলিশের নির্যাতনে একজন অটোরিকসা চালকের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ছাড়া এক সাংসদ পুত্রের টর্চারসেল ও ভূমি দখলসহ নানা অপরাধের খবর বেশ সমালোচিত হয়।

বছরটিতে দুর্নীতিবাজদের অপ্রদর্শিত অর্থ ও বিদেশে বিশেষত ইউরোপ এবং আমেরিকার দেশসমূহে পাচার করা অর্থ ফেরত এনে ফ্ল্যাট-প্লট কিনার ফলে আবাসন খাতের ব্যবসা ঘুরে দাঁড়িয়েছে। অপরদিকে বিশাল অঙ্কের অর্থ আত্মসাতের সঙ্গে জড়িত পি.কে. হালদার বছর জুড়েই আলোচিত ছিল। নভেম্বর মাসে বিদেশে অর্থ পাচারে সরকারি চাকুরেরা সবচেয়ে এগিয়ে থাকার খবরটি কানাডার 'বেগম পাড়া'কে নতুন করে আলোচনায় নিয়ে আসে।

এ বছরটিতেও আগের বছরগুলোর মতো রোহিঙ্গাদের অপরাধ, পার্বত্য চট্টগ্রামে সংগঠন ভিত্তিক চাঁদাবাজি-হত্যা-পাল্টা হত্যা, সীমান্তে হত্যার ঘটনা ঘটেছে। তবে বছরটিতে দেশে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক সহিংসতা, জঙ্গি হামলা ও গুপ্ত হত্যার কোনও ঘটনা ঘটেনি। একই দলের মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাতের কিছু ঘটনা ঘটেছে। দেশের কিছু অঞ্চলে গ্রামে গ্রামে মারামারির ঘটনা এ বছরও কিছু ঘটেছিল।

দেশে সাইবার অপরাধ সবচেয়ে বেশি বেড়েছে এবং যার হার ক্রমেই ঊর্ধ্বমূখী বলে গণমাধ্যমে প্রকাশিত পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে। এটি নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ পুলিশ নতুন আলাদা ইউনিট গঠন করে কাজ করেছে। এবছরটিতেও ৯৯৯-ন্যাশনাল ইমার্জেন্সি সার্ভিস অপরাধ প্রতিরোধে বেশ ইতিবাচক সাড়া ফেলেছে। জনগণের মধ্যে তা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

কৃষক ও শ্রমিক

বাংলাদেশের সর্বশেষ কৃষিশুমারী ২০১৯ অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট খানার সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি যার মধ্যে পল্লি এলাকায় বসবাস করে প্রায় ৩ কোটি। এর মধ্যে কৃষি খানার সংখ্যা অর্ধেকের কম (৪৬.৬১ শতাংশ) এবং এই পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। দেশের **১১.৩৩** শতাংশ খানার কোন নিজস্ব জমি নেই। ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টস স্ট্যাটিস্টিক্স ২০২০ অনুযায়ী ২০১৯-২০ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান **১৩.০২** শতাংশ যার ভেতর মূলত তিনটি উপ-খাত (ক) শস্য ও উদ্যান (খ) পশুপালন ও (গ) বনায়ন ও অন্যান্য সেবাসমূহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তার আগের বছর জিডিপিতে কৃষিখাতের অবদান ছিল **১৩.৩২** শতাংশ। ২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষিখাতের সামগ্রিক প্রবৃদ্ধি হার ধারণা করা হয়েছিল **৩.১১** শতাংশ যা পূর্বের অর্থবছরে ছিল ৩.৯২ শতাংশ। প্রতিবেদনে (নভেম্বর ২০২০) আরো উল্লেখ করা হয় যে, আমনসহ অন্যান্য শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থবছরে শস্য ও

উদ্যান উপ-খাতে ০.৮৯ শতাংশ বেশি প্রবৃদ্ধি হতে পারে। গত অর্থবছরের আউস ধানের উৎপাদন ধরা হয়েছিল ২৭.৫৪ লাখ মেট্রিক টন, আমন ধানের উৎপাদন ১৪০.৬৩ লাখ মেট্রিক টন এবং বোরো ধানের উৎপাদন ১৯৫.৬০ লাখ মেট্রিক টন। অন্যদিকে ভুট্টার উৎপাদন বিগত সময়ের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে বলে প্রতিবেদনে উঠে এসেছে। গত বছর ভুট্টার অনুমিত উৎপাদন ছিল ৩৫.৬৯ লাখ মেট্রিক টন ও গমের উৎপাদন ১০.১৬ লাখ মেট্রিক টন। গত অর্থবছরে পাটের উৎপাদন ছিল ৮৫.৭৬ লাখ বেলস (bales) যা পূর্বের অর্থবছরের উৎপাদনের চেয়ে কম। তাছাড়া ডাল, মশলা, আখ, ফল, শাক-সবজী ও তামাকের মত কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যগুলো গতবছরে এই উপ-খাতের প্রায় ৩০ শতাংশ অবদান রাখতে পারে বলে উল্লেখ করা হয়। আবার কৃষিখাতে শস্য উৎপাদনের পাশাপাশি অ-শস্য কৃষিজ উপখাত যেমন পশুপালন, বনায়ন ও মাছ চাষের প্রবৃদ্ধি হার গতবছরের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

মনে হচ্ছিল করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কৃষি-শ্রমিকরা যদি দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত করতে না পারে তা হলে কৃষকরা ধান কাটা নিয়ে বিপাকে পড়তে পারে। বিশেষত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাওর এলাকায় ধান কাটা শেষ করতে না পারলে বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষকরা খুব ভালোভাবেই তা সামলেছে।

২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষিখাতের পর দেশের জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৩৫.৩৬ শতাংশ যেখানে প্রবৃদ্ধি হার অনুমান করা হয়েছিল ৬.৪৮ শতাংশ যা পূর্বতন অর্থবছরে ছিল ১২.৬৭ শতাংশ। আর জিডিপিতে সর্বোচ্চ অবদান রেখেছে সেবা খাত (৫৫.৮৬ শতাংশ) যা পূর্বতন অর্থবছরে ছিল ৫৫.৫৩ শতাংশ।

২০২০ সালের কৃষি ও শ্রমবাজারে করোনা ভাইরাসের নেতিবাচক প্রভাব ছিল প্রকট। করোনার প্রভাবে দেশের অভ্যন্তরে কিংবা বহির্বিশ্বের সাথে পণ্য আমদানী রপ্তানীতে সংকট সৃষ্টি হয়। করোনার প্রভাবে দেশের অভ্যন্তরে যোগাযোগ ব্যবস্থা সীমিত করার কারণে কৃষিজ কাঁচামাল পরিবহনে সমস্যা দেখা যায়। যার ফলে প্রায় সারাদেশেই কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল বিশেষত নগর অঞ্চলে। এছাড়া কয়েক দফা বন্যার প্রভাবে দেশে শীতকালীন সবজী উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্থ ও বিলম্ব হয়। এর প্রভাবে প্রায় সারাবছর শাক সবজীর দাম উর্ধ্বমূখী ছিল। এবছর ভারী বৃষ্টিপাত ও বন্যার কারণে আমন ধানের ফসল নষ্ট হওয়ায় ধান ও চালের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০১৯ সালের মত ২০২০ সালেও নির্দিষ্ট কিছু পণ্য যেমন পেঁয়াজ, আলু ইত্যাদির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির ঘটনা আলোচনায় ছিল। এক পর্যায়ে প্রতি কেজি পেঁয়াজ ১৩০ টাকা ও আলু ৫০ টাকায় বিক্রি হয়।

করোনা ভাইরাসের প্রভাবে খামারি পর্যায়ে মুরগি, ডিম ও দুধের দাম উল্লেখযোগ্যভাবে কমে গিয়েছিল। দৈনিক পত্রিকা মারফত জানা যায় যে, খামারিরা করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শুরুর দিকে প্রতিদিন গড়ে প্রায় এক লাখের মতো মুরগির বাচ্চা মাটিতে পুঁতে ফেলেছিল। পোলট্রি খাতে কয়েক হাজার কোটি টাকা লোকসান হয়েছে বলে দাবি করা হয়। কাঙ্ক্ষিত মূল্যে বিক্রি করতে না পেরে অনেকে দুধ ফেলে দিয়েছে। এ ছাড়া লকডাউনের কারণে মৎস্য খামারিরা মাছের পোনা সংগ্রহ ও অবমুক্ত করতে পারছিলনা বলে জানা যায়, যা সামগ্রিকভাবে মাছের উৎপাদনকে বিঘ্নিত করেছে। এছাড়া মে মাসের শেষের দিকে ঘূর্ণিঝড় আম্পানের কারণে কৃষিতে ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, ঘূর্ণিঝড় আম্পানের প্রভাবে কয়েক হাজার হেক্টর জমির খাদ্য শস্য, পানের বরজ, ফলের বাগান ও শাক-সবজির আবাদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। তবে এবছর কৃষিকে কেন্দ্র করে কৃষকদের মাঝে তেমন কোন সংগঠিত অসন্তোষ বা আন্দোলন দেখা যায়নি।

বোরো মৌসুমে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কৃষকদের মাঝে ধান কাটা নিয়ে উৎকণ্ঠা সৃষ্টি হলেও তা স্থায়ী হয়নি। প্রথমদিকে মনে হচ্ছিল করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কৃষি-শ্রমিকরা যদি দেশের অভ্যন্তরে যাতায়াত করতে না পারে তা হলে কৃষকরা ধান কাটা নিয়ে বিপাকে পড়তে পারে। বিশেষত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে হাওর এলাকায় ধান কাটা শেষ করতে না পারলে বন্যার পানিতে ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কৃষকরা খুব ভালোভাবেই তা সামলেছে। করোনা ভাইরাসের প্রকোপের কারণে বেশিরভাগ শিক্ষার্থী ও অভ্যন্তরীণ অভিবাসীরা নিজ নিজ গ্রামে অবস্থান করায় প্রায় সবাই একত্রে ধান কাটার কাজে যুক্ত হয়। শুধু তাই নয়, বরং এবছর কৃষকেরা গতবারের তুলনায় বোরো মৌসুমে বেশি ফলন পেয়েছে। ধানের দাম নিয়েও কৃষকদের মাঝে তেমন অসন্তোষ দেখা যায়নি।

২০২০ সালে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে দেশে তৈরি পোশাক রপ্তানির প্রবৃদ্ধি কমেছে। কারখানাগুলো কয়েক মাস সম্পূর্ণ বা সীমিত আকারে বন্ধ ছিল। ছোট আকারের কিছু কিছু কারখানা বন্ধ হয়ে গিয়েছে, কাজ হারিয়েছে অনেক শ্রমিক। উৎপাদন খরচ বেড়ে যাওয়া, চাহিদা হ্রাস, ক্রয়াদেশ বাতিল এবং রপ্তানী বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তবে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সেবা খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ দিতে সরকার ৪০ হাজার কোটি টাকার বেশি প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করেছিল।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ২০১৯ অনুযায়ী দেশের মোট জনসংখ্যা ১৬৪.৬ মিলিয়ন যেখানে নারী ৮২.২ মিলিয়ন এবং পুরুষ ৮২.৪ মিলিয়ন। মোট জনসংখ্যার ১০৯.১ মিলিয়ন জনগোষ্ঠী যাদের বয়স ১৫ বছরের উর্ধ্বে। এদের মধ্যে ৬৩.৫ মিলিয়ন কর্মক্ষম, যার ভেতর ৬০.৮ মিলিয়ন শ্রমবাজারে নিয়োজিত আছে (শ্রম শক্তি জরিপ ২০১৬-১৭)। দেশের শ্রম বাজারে অংশগ্রহণ হার ৫৮.২ শতাংশ যেখানে পুরুষের উপস্থিতি ৮০.৫ শতাংশ এবং নারীর উপস্থিতি ৩৬.৩ শতাংশ। শ্রম বাজারের বাইরে রয়েছে ৪১.৮ শতাংশ জনগোষ্ঠী। আবার ২৯.৮ শতাংশ লোক রয়েছে যারা শিক্ষা, কর্ম কিংবা প্রশিক্ষণ কোন কিছুতেই নেই। মোট কর্মখাতের ৮৫.১ শতাংশ অনানুষ্ঠানিক খাত আর মাত্র ১৪.৯ শতাংশ আনুষ্ঠানিক। পেশাগতভাবে কৃষিখাতে দক্ষ শ্রমিক হিসেবে সর্বোচ্চ ৩২.৪ শতাংশ নিয়োজিত রয়েছে আবার খাতভিত্তিকভাবেও সর্বোচ্চ ৪০.৬ শতাংশ লোকবল কৃষিকাজের সাথে যুক্ত।

বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ৪.২ শতাংশ যার পরিমাণ সংখ্যায় ২.৭ মিলিয়ন। যাদের ২২ লাখেরই বয়স ২৯ বছরের কম। পুরুষের বেকারত্ব ৩.১ শতাংশ অন্যদিকে নারীর বেকারত্ব ৬.৭ শতাংশ। সর্বশেষ শ্রম শক্তি জরিপ ২০১৬-১৭ অনুযায়ী প্রাতিষ্ঠানিকভাবে অশিক্ষিতদের তুলনায় শিক্ষিতদের বেকারত্ব হার ৩ গুণ বেশি। শিক্ষার লেভেল বিবেচনায় উচ্চশিক্ষিতদের মাঝে বেকারত্বের হার ঊর্ধ্বমুখী। যেমন, নিম্নমাধ্যমিকের তুলনায় উচ্চমাধ্যমিক পাশকৃতদের বেকারত্ব প্রায় ৪ গুণ আর স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তরদের মাঝে বেকারত্ব ৩ গুণ বেশি। তবে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে ২০২০ সালে এই বেকারত্ব হার বৃদ্ধি পেয়েছে। যেখানে দেশে তরুণদের বেকারত্বের হার সামগ্রিক গড় বেকারত্ব হারের তিনগুণ সেখানে আবার করোনার প্রভাবে এই তরুণদের মাঝেই বেকারত্বের পরিমাণ আরো বেড়েছে। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি) ও আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার (আইএলও) এর ‘ট্যাকলিং দ্য কভিড-১৯ ইয়ুথ এমপ্লয়মেন্ট ক্রাইসিস ইন এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক’ (আগস্ট ২০২০) শীর্ষক প্রতিবেদনে দাবি করা হয় যে, করোনার আগে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সী তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার ছিল ১২ শতাংশ যা এরই মধ্যে দ্বিগুণ হয়েছে।

পরিবেশগত পর্যালোচনা

বিগত বছরের শুরু থেকেই ভাইরাস সৃষ্ট রোগ, কোভিড-১৯, বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে যাকে পরবর্তীতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা মহামারী হিসেবে ঘোষণা করে। এই রোগ সর্বপ্রথম মানুষের শরীরে সানাক্ত হয় ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে চীনের উহান শহরে। বাংলাদেশে ৮ই মার্চ ২০২০ সর্বপ্রথম এই ভাইরাস সনাক্ত হয়। বিশ্বব্যাপী বন উজাড়, বণ্যপ্রাণী নিধন, বন্যপ্রাণীর আবাসস্থল বিনাশ, পরিবেশ দূষণ ও অন্যান্য মানব সৃষ্ট বিপর্যয় সৃষ্টির ফলসরূপ এরকম ভাইরাস অভিযোজিত হয়ে মানুষের শরীরের সংস্পর্শে এসেছে। পরিবেশের উপর বিরূপ আচরণের ফলসরূপ পৃথিবীব্যাপী যে অস্থিরতা ও অনিশ্চিয়তা সৃষ্টি হতে পারে কোভিড-১৯ মহামারী তার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পরিবেশবিদরা তাই বিশ্বব্যাপী পরিবেশ দূষণ ও অবক্ষয় রোধ, জীববৈচিত্র্য বিনাশ ও তাদের আবাসস্থল বিনষ্ট বন্ধ করার ওপর জোর দিচ্ছে। এবারে বিশ্ব পরিবেশ দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছিল 'প্রকৃতির জন্য সময়'। আবার প্রকৃতির ওপর গুরুত্বারোপ করেই ২০২০ সালের আন্তর্জাতিক জীববৈচিত্র্য দিবসের প্রতিপাদ্য ছিল 'প্রকৃতিতেই রয়েছে আমাদের সমাধান'।

২০২০ এর এপ্রিল-মে মাস সময়কালে ঢাকা শহরে বায়ুমান সূচকের মান ৩৫% পর্যন্ত হ্রাস পায় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায়, যদিও একই সময়ে ঢাকায় দূষণের গড় শতকরা হ্রাসের পরিমাণ বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিভিন্ন শহরের তুলনায় কম ছিল, এমনকি দিল্লীতে শতকরা দূষণ হ্রাসের পরিমাণ ঢাকার চেয়ে বেশি ছিল।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ মহামারী বিস্তার নিয়ন্ত্রণের জন্য ভাইরাস বিস্তারের শুরুর দিক থেকেই বিভিন্ন মেয়াদে লকডাউন ঘোষণা করে আসছে। বাংলাদেশ সরকারও ভাইরাসের বিস্তৃতির গতিবিধি পর্যালোচনা করে ২৬ মার্চ ২০২০ থেকে ৩০ মে ২০২০ পর্যন্ত সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। এ সময় অর্থনৈতিক কার্যাবলী সীমিত থাকার কারণে ঢাকাসহ সমগ্র বাংলাদেশে বায়ুদূষণ প্রশমিত হয় এবং বায়ুমান সূচকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত বাংলাদেশেরও উন্নতি ঘটে। বিখ্যাত প্রকাশক 'স্প্রিনজার' এর 'এয়ার কোয়ালিটি, এটমোস্ফিয়ার এন্ড হেল্‌থ' সাময়িকীতে প্রকাশিত এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয় যে, লকডাউনের সময়কালে বাংলাদেশের বায়ুদূষণ কবলিত প্রধান প্রধান শহর সমূহের বায়ুমন্ডলে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ও ওজোন গ্যাস লকডাউনের ঠিক পূর্বের সময়কালের তুলনায় যথাক্রমে ৪০%, ৪৩%, ৪% এবং ৩% কমেছিল যেখানে সর্বাধিক দূষণ কবলিত শহর ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ শহরের বায়ুমন্ডলে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড ও ওজোন গ্যাসের গড় শতকরা হ্রাসের পরিধি ছিল যথাক্রমে ৬২.৮৪-৬৯.২৪%, ৪০.৫০-৬৬.৬১%, ৫.২০-৭.১৭% এবং ২.৬২-২.৯৭%. একই সময় ঢাকা নগরীতে বাতাসে ভাসমান বস্তুকণা ($পিএম_{২.৫}$) এর গড় মান ৬৫ মাইক্রোগ্রাম/$মিটার^{৩}$ থেকে কমে দাড়ায় ৫০ মাইক্রোগ্রাম/$মিটার^{৩}$ যা পূর্ববর্তী বছরের গড় মানের তুলনায় ২৩% কম ছিল। অন্য এক গবেষণায় উল্লেখ করা হয় যে, ২০২০ এর এপ্রিল-মে মাস সময়কালে ঢাকা শহরে বায়ুমান সূচকের মান ৩৫% পর্যন্ত হ্রাস পায় পূর্ববর্তী বছরের তুলনায়, যদিও একই সময়ে ঢাকায় দূষণের গড় শতকরা হ্রাসের পরিমাণ বিশ্বের অন্যান্য দেশের বিভিন্ন শহরের তুলনায় কম ছিল, এমনকি দিল্লীতে শতকরা দূষণ হ্রাসের পরিমাণ ঢাকার চেয়ে বেশি ছিল।

নদ-নদীকে জীবন্ত সত্ত্বা (Living Entity) হিসেবে ঘোষণা দেয়ার পর এ পদক্ষেপকে আরও বেগবান করার জন্য দেশের নদ-নদী, খাল-বিল, জলাশয়, জলাধার, হাওর, বাওর ও সমূদ্র উপকূলের দূষণ, অবৈধ দখল এবং এদের স্বাভাবিক গতি-প্রকৃতি ও প্রবাহ রক্ষা করার জন্য ২০১৩ সালের জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন সংশোধন করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন ২০২০ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। এই আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করা হলে নদ-নদীর স্বভাবিক প্রবাহ ও নাব্যতা রক্ষা, নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি, দখল ও দূষণ রোধ এবং সর্বোপরি আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সম্ভব হবে। শিল্প কারখানায় পানির সুষম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, কারখানা থেকে নিঃসৃত বর্জ্য পানি কর্তৃক আশেপাশের নদ-নদী, খাল-বিল, জলাভূমি ও জলাশয় দূষণ রোধ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) 'শিল্প খাতে পানি ব্যবহার নীতি' (Industrial Water Use Policy) প্রণয়ন করেছে। আবার বাংলাদেশ পানি বিধিমালা ২০১৮ তে উল্লেখিত জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন পর্যায়ে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ওয়ারপো জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনা গাইডলাইন, ২০২০ প্রণয়ন করেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণের চিন্তায় গত কয়েক বছরে বেশ কিছু অঞ্চলকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা (ECA) বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন অধিদপ্তর এসব অঞ্চলগুলো নিয়ে নানারকম কার্যক্রম নিয়ে থাকে। এই বছর এই রকম বেশ কিছু স্থানকে ঘিরে উন্নয়ন কর্মকান্ড, ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন জায়গায় উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ছিল। স্থানীয় প্রভাবশালী, ক্ষমতাধর ও অন্যান্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নদ-নদী, খাল-বিল, জলাভূমি ও জলাধার অবৈধ দখল হলে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পরিবেশ অধিদপ্তরকে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক একটি দাপ্তরিক আদেশও জারি করা হয়েছে। বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ মহামান্য হাইকোর্টের আদেশ অনুযায়ী ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জ নদী বন্দরের আওতাধীন বুড়িগঙ্গা, তুরাগ ও শীতলক্ষা নদীর সীমানা পিলারের অভ্যন্তরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করে মোট ৩৩১৪ টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে এবং ১০৬ একর তীরভূমি উদ্ধার করে। তাছাড়া বিগত অর্থবছরে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দেশের নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নতি ও নদীগুলোর নাব্যতা ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন নৌপথ ও নদীতে মোট ৩০০ কিলোমিটার খনন কাজ পরিচালনা করেছে। অনিয়ন্ত্রিত পর্যটন এবং দুষণের ফলে দেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ সেন্ট মার্টিনে পরিবেশ বিপর্যয় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে এবার মহামারির কারণে সাধারণ ছুটির সময়কালে সেন্টমার্টিনসহ অন্যান্য জায়গায় পর্যটক কিছুটা কম ছিল, যদিও পরবর্তী সময়ে তা আবার বেড়েছে। আরেক সংকটাপন্ন এলাকা কক্সবাজার এবং তার আশপাশের অঞ্চলে রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সমাগমের পরিবেশ নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে। তবে ইতিমধ্যে কক্সবাজার থেকে বেশ কিছু রোহিঙ্গাকে ভাষাণচরে স্থানান্তর করা হয়েছে। এতে পরিবেশগত সমস্যা কিছুটা কমার আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে দেশজুড়ে বনায়ন কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ১২,০০০ হেক্টর ব্লক বাগান, ৬,০০০ হেক্টর ম্যানগ্রোভ বাগান এবং ১,৩৫০ কিলোমিটার স্ট্রীপ বাগান সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী ও জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ২০২০ উপলক্ষে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক সারাদেশে ০১ কোটি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচী হাতে নেওয়া হয়। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের তথ্য মতে, বাংলাদেশে বর্তমানে মোট বৃক্ষ আচ্ছাদিত ভূমির পরিমাণ (বনের অভ্যন্তর ও বাইরে) দেশের মোট আয়তনের তুলনায় ২২.৩৭% যা ২০২৫ সালের মধ্যে ২৪% এ উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যেখানে মোট বনভূমির পরিমাণ (শুধু বনের অভ্যন্তরে) দেশের মোট আয়তনের ১২.৮%। বাংলাদেশে প্রথমবারের মত উদ্ভিদ প্রজাতির একটি 'রেড লিস্ট' প্রণয়ন এবং ক্ষতিকর বিদেশি উদ্ভিদ প্রজাতি ব্যবস্থাপনা কৌশল নিরূপণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ বন অধিদপ্তর একটি

প্রকল্প গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বিদেশি ক্ষতিকর প্রজাতি ফলপ্রসূ ব্যবস্থাপনা কৌশল নিরূপণের মাধ্যমে দেশীয় প্রজাতির উদ্ভিদকূলের বিপন্নতার হাত থেকে উত্তরণের একটি উপায় নির্ণয় সম্ভব হবে।

বিভিন্ন গবেষণার ফলাফল থেকে প্রাপ্ত তথ্যমতে এ বছর দেশে ৫০ টিরও বেশি নতুন প্রজাতির বন্য উদ্ভিদ ও প্রাণীর দেখা মিলেছে। নতুন প্রজাতি সমূহের মধ্যে সামুদ্রিক মাছের প্রজাতি পাওয়া গিয়েছে ২০টি, কাঁকড়ার প্রজাতি রয়েছে ৫টি, পাখির প্রজাতি রয়েছে ৭টি যার মধ্যে সামুদ্রিক পাখিই রয়েছে ৬টি, ১৪টি সাপ ও ব্যাঙের প্রজাতি যেখানে ব্যাঙের একটি প্রজাতি *R. rezakhani*, বিজ্ঞানে নতুন যেটার নামকরণ করা হয়েছে বাংলাদেশের ওয়াল্ড লাইফ বায়োলজির অন্যতম পথিকৃৎ ড. রেজা খানের নামানুসারে। আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগ ও জাতীয় ঔষধিশালা বাংলাদেশ এর যৌথ গবেষণায় লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানে বন্য কচুর ৪ টি নতুন জাতের সন্ধান মিলেছে। আবিষ্কৃত বেশিরভাগ প্রাণীই সমুদ্রকেন্দ্রিক বাস্তুসংস্থানে পাওয়া গিয়েছে, বিশেষ করে সেন্ট মার্টিন দ্বীপে। বাংলাদেশের সমুদ্র ও তার উপকূলীয় জীববৈচিত্র্য যে অনেক সমৃদ্ধ তা এই প্রতিবেদন থেকে অনুমান করা যায়। বন্য প্রাণী সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে এ পর্যন্ত ৪৮টি সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে যা দেশের মোট আয়তনের ৪.২৬ শতাংশ। বিগত বছরেও ডলফিন সংরক্ষণের জন্য পানখালী বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য, শিবশা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য ও ভদ্রা বন্যপ্রাণী (ডলফিন) অভয়ারণ্য নামের ৩টি নতুন ডলফিন অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয়েছে। বন্যপ্রাণী অপরাধ দমন ইউনিট 'বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও আবাসস্থল উন্নয়ন প্রকল্প' এর অধীনে নিয়মিতভাবে অভিযান কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে; যার ধারাবাহিকতায় ২০১৯-২০ অর্থবছর পর্যন্ত তারা ৩১,১৯৭টি বন্যপ্রাণী উদ্ধার করে প্রকৃতিতে অবমুক্ত করতে সক্ষম হয়। আবার বন্যপ্রাণীর আক্রমনে ক্ষতিগ্রস্থদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার বিধান প্রণীত হওয়ার পর থেকে সরকার নিয়মিতভাবে ক্ষতিগ্রস্থদের মাঝে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে আসছে, যেখানে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ১২৩ জন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তিদের মাঝে মোট ৫৪ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়।

প্রতিবছরের ন্যায় বিগত বছরেও বন্যা ও ঘূর্ণিঝড়ের কবলে পড়ে বাংলাদেশ। গত বছরের মে মাসে ঘূর্ণিঝড় আম্ফান বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড় আম্ফানের প্রভাবে দেশের ৩৬টি জেলা আক্রান্ত হয় এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের দেওয়া তথ্য অনুসারে আম্ফান ১০ জনের জীবন কেড়ে নেয়। রাস্তা-ঘাট, বাড়ি-ঘর, কৃষি, মৎস্য ইত্যাদির প্রায় ১১০০ কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাপ করা হয়েছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে। এবারও বাংলাদেশের ফুসফুস খ্যাত সুন্দরবন আম্ফানের গতিবেগ কমিয়ে দিয়ে দেশকে বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করেছে। ২০২০ সালের বন্যাকে শতাব্দীর দীর্ঘস্থায়ী বন্যা বলা হয়েছে যা ১৯৯৮ সালের পর বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি সময়, প্রায় দেড় মাস ব্যাপি স্থায়ী ছিল। এ বন্যায় ৩৩ জেলা প্রত্যক্ষভাবে আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের হিসার মতে এ বন্যায় ৫ হাজার ৯৭২ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। তাই এই সকল অবকাঠামো নির্মাণকে আরও টেকসই করার উদ্দেশ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর দেশে সড়ক ও মহাসড়ক নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রথম বারের মত প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত ঝুঁকির বিবেচনায় নিয়ে একটি মূলনীতি প্রণয়নের প্রস্তুতি নিচ্ছে। এ বিষয়ে উক্ত অধিদপ্তর উপকূলবর্তী এলাকার মহাসড়কের জন্য জলবায়ু পরিবর্তন ও রেজিলিয়েন্ট ডিজাইনের প্রভাব শীর্ষক একটি পাইলট প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

করোনা মহামারীর কারনে এ বছর মেডিকেল বর্জ্যের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল। তবে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক করোনাকালীন মেডিকেল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা একটি নীতিমালা প্রণয়ন করায় এ সংক্রান্ত ঝুঁকি অনেকটাই কমানো সম্ভব

হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ ই-বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা ২০১৯ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। বিধিমালা বাস্তবায়নের প্রথম বছরেই উৎপাদিত বর্জ্যের ১০% সংগ্রহের লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যা বিধিমালা বাস্তবায়নের পঞ্চম বছরে ৫০% এ উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া এই বিধিমালায় কিছু বিপজ্জনক পদার্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মানমাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে।

দূর্যোগ প্রবন এ দেশে সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা ছাড়া উন্নয়নকে দীর্ঘস্থায়ী করা সম্ভব না। সেই লক্ষ্যেই সরকার শতবর্ষী ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ হাতে নিয়েছে। তাছাড়া টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ তাদের প্রকল্পসমূহকে শতবর্ষী ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সাথে সমন্বয় করে নিচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ তার এসডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০২০ প্রকাশ করেছে, যেখানে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক ঝুঁকি ও দূর্যোগ মোকাবেলা, সাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ ও এর সুষ্ঠ ব্যবহার, বন ও সংরক্ষিত এলাকার সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য অর্জনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

২০২০ সালে পরিবেশ রক্ষার জন্য বড় কোন আন্দোলন আলোচনায় আসেনি। আবার গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিতব্য জলবায়ু সম্মেলন (COP26) বৈশ্বিক করোনা মহামারীর কারণে স্থগিত করা হয়েছে যা ২০২১ সালের নভেম্বরে আয়োজনের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে জাতিসংঘ সচিবালয় 'জাতীয়ভাবে নির্ধারিত অবদান' প্রতিবেদন জমা দিতে বলেছিল; যেখানে বাংলাদেশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই এই প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। এদিকে ২০২০ সালে প্রকাশিত জার্মান ওয়াচের জলবায়ু ঝুঁকি সূচকে ১৯৯৯ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত সময়ে জলবায়ু সংশ্লিষ্ট দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ দেশের তালিকায় বাংলাদেশ সপ্তম স্থানে রয়েছে। ইয়েল ও কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত এনভারনমেন্টাল পারফরমেন্স সূচকে বাংলাদেশ ১৭ ধাপ এগিয়ে এখন ১৬২ তম স্থানে রয়েছে, যদিও দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের মধ্যে বাংলাদেশ শুধু ভারত ও আফগানিস্তানকে পেছনে ফেলতে পেরেছে।

পরিবেশ সংরক্ষণ, দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ বিষয়ে শিক্ষা ও গবেষণার প্রচারে ভূমিকা রাখার জন্য প্রতিবছর 'জাতীয় পরিবেশ পদক' প্রদান করা হয়। এছাড়া বন্যপ্রাণী এবং জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বঙ্গবন্ধু জাতীয় পুরস্কার বিধিমালা ২০১৯ এর অধীনে প্রতিবছর ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সম্মানজনক 'বঙ্গবন্ধু এ্যাওয়ার্ড ফর ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন' পদক প্রদান করা হচ্ছে। আবার নদী রক্ষায় অবদানের জন্য প্রতি বছর জেলা পর্যায়ে ০১টি ও জাতীয় পর্যায়ে ০৩টি করে 'বঙ্গবন্ধু নদী পদক' প্রদান করা হয়। এবারে পরিবেশগত বিষয়ে ন্যায়বিচার প্রচার ও পরিবেশ বান্ধব আইনশাস্ত্র বিকাশে ভূমিকা রাখার জন্য বাংলাদেশ পরিবেশ আইনজীবি সমিতি (BELA) আরও ০২টি সংগঠনের সাথে যৌথভাবে আইনের শাসনে আন্তর্জাতিক টাং পুরস্কার ২০২০ লাভ করে।